মোহাম্মদ বারিফি

তরজুমাতে
গাউছিল্লাহিল আজম
মাইজভান্ডারী

শাহ ছুফি মওলানা
মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল গণি (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) ইসলামাবাদী
অনুবাদক: মোহাম্মদ আলী আছগর

আয়নায়ে বারি

ফি

তরজুমাতে গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী

লেখক :

শাহ ছুফী মওলানা মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল গণি (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) ইসলামাবাদী

অনুবাদক :

মোহাম্মদ আলী আছগর

প্রকাশনায় :

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি
রোড নং ০৪, দক্ষিণ খুলশী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ।

লেখক

শাহ ছুফী মওলানা মুহাম্মদ সৈয়দ আবদুল গণি (কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু) ইসলামাবাদী

অনুবাদক

মোহাম্মদ আলী আছগর

পৃষ্ঠপোষক

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

সম্পাদক

সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

গ্রন্থস্বত্ব © দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

২৮ মার্চ ২০২৪ ইংরেজি (১৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি)

বর্ণবিন্যাস, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
মোবাইল : +৮৮০ ১৮১৯ ২৮৯৭১৬, +৮৮০ ১৭১১ ৮১৭২৭৪
E-mail : tasauf.darulirfan@gmail.com
Website: www.diri.org.bd

মূল্য : ৫০০/-

US Dollar $20.00

Ayna-e Bari Fi Tarjumati Gawsillahil Azam Maizbhandari by
Shah Sufi Mawlana Mohammad Syed Abdul Goni (Q.) Islamabadi
Translated by Muhammad Ali Asgor
Edited by Syed Irfanul Hoque Maizbhandari
Published by Darul Irfan Research Institute (DIRI)
1st Edition Print : 28 March 2024 (17 Ramadan 1445 AH)
ISBN : 978-984-35-4817-7

উৎসর্গ

আওলাদে রাসুল
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
(মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) এঁর করকমলে
যাঁর দোয়া, দয়া ও বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত
'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)'

সম্পাদকীয়

"আয়নায়ে বারী ফী তারজুমাতি গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী" (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন চরিতে আল্লাহ্‌র দর্পন), যাহা বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ) এঁর জাতে মোবারককে কেন্দ্র করে রচিত এক অমূল্য আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ) এঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক আলোচিত হওয়ার পাশাপাশি তাসাউফ শাস্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচিত হয়েছে। যাহা খোদা অনুসন্ধানী আশেকদের রূহী খোরাক ও ইলমে মা'রেফতের জ্ঞান আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন তৎকালিন পাক-ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার গোল্ডমেডেলিস্ট হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ); যিনি ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর প্রিয় খলিফা ও পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা, অতুলনীয় মেধা শক্তির কারণে তিনি তাঁর সময়ে বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সাগর) হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থটির ভাষা শৈলী, শব্দ চয়ন, ভাব ও শে'রসমূহ পর্যালোচনা করলে তাঁর জ্ঞান-গরিমার কিঞ্চিত নমুনা পাওয়া যায়। তিনি ১৩৩০ হিজরী সনে এই গ্রন্থটির রচনা শেষ করেন। ইহা উর্দু ভাষায় রচিত এবং অধিকাংশ শে'রসমূহ উর্দু ও ফার্সি ভাষার। আল্লামা রুমী, ফরিদ উদ্দীন আত্তার, হাফেজ সিরাজি, আব্দুর রহমান জামি, শেখ সাদী সিরাজী, আমির খসরু সহ বিভিন্ন সুফি কবিদের অনেক শে'র এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি অধিকাংশ শে'রসমূহে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ) এঁর প্রতি তাঁর অগাধ ও অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

যেহেতু এই কিতাবখানি হযরতের (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ) মর্জি মতে তিনি রচনা করেছিলেন। যাতে হযরতের (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল

আজিজ) বেলায়তের মকাম, তাঁর মর্তবা, কেরামত ও তাঁর ওফাতের পূর্বাপর অনেক বিরল ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া তরিকাসমূহের ক্রমবিকাশ, তাওহিদের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং পীর-মুরিদী সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে। সেই কারণে সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আজিজ) এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে গ্রন্থকারের ছেলে হজরত মওলানা মুফ্‌তি সৈয়দ ফদলুল বারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হতে গ্রন্থের মূল কপি সংগ্রহ পূর্বক ছাপিয়ে ছিলেন এবং আশেক-ভক্ত ও তরিকত পন্থীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) তাঁর মুর্শিদের অনুসরণে সর্বস্তরের আশেকান ও তরিকতপন্থীদের চাহিদা মেটাতে গ্রন্থটি পুণঃমুদ্রণ করেন।

এই গ্রন্থটি উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত হওয়ায় এবং বর্তমানে উর্দু ও ফার্সি ভাষা চর্চা কমে যাওয়াতে বাংলা ভাষাভাষী আশেক, ভক্ত ও তরিকতপন্থীদের জন্য এই গ্রন্থ থেকে পাঠোদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থটির ভাষা শৈলী, শব্দ চয়ন ও ভাব উচ্চ মার্গের হওয়াতে ইহার বঙ্গানুবাদ সহজসাধ্য হয়ে উঠেনি। তাই তারা বর্তমান সাজ্জাদানশীন কেবলার কাছে এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ অনেক দিন ধরে তালাশ করছিলেন। তাদের চাহিদার প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং মাইজভাণ্ডারী তরিকা, দর্শন, ও সুফিবাদের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) মাইজভাণ্ডারী তরিকার নীতি আদর্শ বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার প্রত্যয়ে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI) প্রতিষ্ঠা করেন। দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI) প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুফিবাদ ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার একাডেমিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক-গ্রন্থ, গবেষণা-জার্নাল, অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় "আয়নায়ে বারী ফী তারজুমাতি গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী" গ্রন্থটির অনুবাদে উদ্যোগ গ্রহণ করি। কারণ এই গ্রন্থটির অনুবাদ সময়ের দাবি হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। আর সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী আশেক, ভক্ত ও তরিকতপন্থীগণ এই মহামূল্যবান মা'রেফতের খনি থেকে জ্ঞান আহরণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছিল। তাই, আমার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI) রিসার্চ ফেলো স্নেহাস্পদ মওলানা মোহাম্মদ আলী আছগরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইহার বঙ্গানুবাদ দাঁড় করাতে সক্ষম হই। আশাকরি এই গ্রন্থটি আশেক ও তরিকতপন্থীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভে সহায়ক হবে।

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI) কর্তৃক *আয়নায়ে বারি ফী তারজুমাতি গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী* বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। এই গ্রন্থের সার্বিক সফলতা কামনা করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ॥

ধন্যবাদান্তে,

সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ

ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

তারিখ : ১৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি, ২৮ মার্চ ২০২৪ ইংরেজি

পৃষ্ঠপোষকের ভাষ্য

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসুলিল্লাহ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন।

ইসলামের হেদায়তের ধারাকে বলবৎ রাখার জন্য এবং গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর নীতি-আদর্শ ও তরিকাকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে গাউছিয়ত সরকারের ধারাবাহিকতা জারি রাখতে আমার পীরে তরিকত, সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ) আমাকে যোগ্যতম ঘোষণা করে তাঁর একমাত্র সাজ্জাদানশীন ও গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার পর আমার মুর্শিদ আমাকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট ও খুলনা-এই চারটি প্রধান শহরে চারটি খানকা প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও আধ্যাত্মিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমি চারটি প্রধান শহরে চারটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং খানকা ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আর বৃহৎ পরিসরে ইসলাম, তাসাউফ ও মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে যুগোপযোগী গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে আমি ২০১৯ সালে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)' প্রতিষ্ঠা করি এবং আমার একমাত্র পুত্র ও গদীর স্থলাভিষিক্ত বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন শাহ্‌জাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারীকে ম্যানেজিং ট্রাস্টির দায়িত্ব প্রদান করি। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের ব্যবধানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর নজরকরমে বিশ্বপরিমন্ডলে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশ- বিদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)' এর সাথে কাজ করছে এবং করার আগ্রহ দেখিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক-গ্রন্থ, গবেষণা-জার্নাল, অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় "আয়নায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী" গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদে উদ্যোগ গ্রহণ করি।

আলহামদুলিল্লাহ! তাসাউফ শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থটি অনুবাদ করতে সক্ষম হই। আশা করি বাংলা ভাষাভাষী আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও তাসাউফপন্থী সুধী মহল ইহা পাঠে উপকৃত হবেন।

ইসলামের সঠিক শিক্ষা, সুফিবাদ ও গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ)-এঁর নীতি-আদর্শ বিস্তারে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)' এর ব্যাপক অবদান, সৃজনশীলতা ও গবেষণামূলক কাজগুলো মানবজাতিকে যুগে-যুগে পথের দিশা দেবে-এ ফরিয়াদ রাখছি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)-এঁর উসিলায় সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আ-মী-ন।

দোয়াগো,

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ;

ট্রাস্টি: দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

তারিখ: ১৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি, ২৮ মার্চ ২০২৪ ইংরেজি

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং সালাত ও সালাম পেশ করছি বিশ্বজাহানের সর্দার মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবেয়ীন এবং তবে' তাবেয়ীনদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রতি।

বিশ্বআজীমের ত্রাণকর্তা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত একমাত্র তরিকা। তিনি জীবদ্দশায় এই তরিকা বিষয়ক নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তাই তাঁর জীবন-চরিত, আদর্শ, তরিকার উছুল, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর গদীর উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বাংলা ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী এবং তাঁর বিশিষ্ট খলিফা শাহ্ ছুফী মওলানা মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত 'আয়নায়ে বারি ফি তারজুমাতে গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী' গ্রন্থটি প্রাইমারি সোর্স হিসেবে অন্যতম ভূমিকা পালন করে চলেছে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর জীবদ্দশায় 'আয়নায়ে বারি' শরীফের রচনা শুরু হলেও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শেষ হয় হযরতের (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ওফাতের পর ১৩৩০ হিজরী সালে। হিজরী সাল অনুযায়ী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ১৩২৩ হিজরী সালে ওফাত প্রাপ্ত হন। আজ থেকে ১১৫ বছর আগে রচিত এই অমূল্য গ্রন্থটি। সেই সময় এই উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বলয়ে ছিল। তখন দ্বীনি শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম ছিল আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষা। ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার পর ফার্সি ও উর্দু ভাষার চর্চা অনেকাংশে কমে যায়। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আলিয়া ধারার মাদ্‌রাসা সমূহে ফার্সি ভাষার চর্চা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য উর্দু ও ফার্সি

ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ হতে পাঠোদ্ধার করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত: ইলমে তাসাউফ ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার মৌলিক গ্রন্থ 'আয়নায়ে বারি ফি তারজুমাতে গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী' গ্রন্থটির ভাষা ও ভাব উচ্চাঙ্গের হওয়ায় বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা সহজ হয়ে উঠেনি। তাই শত বছর পেরোলেও এই গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ এক প্রকার অধরাই থেকে গেছে। অনেক আশেক, ভক্ত ও মুরীদানগণ এই গ্রন্থটির বাংলা অনুদিত ভার্সনের জন্য তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতে দেখেছি। আমি নিজেও কখনো ভাবিনি এই দুঃসাধ্য কাজে সাহস করব। কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ তাঁর এই অধম গোলামের প্রতি পরোক্ষ শুভ ইঙ্গিত পেয়ে দুঃসাহসিক এই অভিযানে পা বাড়িয়েছি। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুবাদ শুরু করি এবং ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে মুর্শিদের মেহেরবাণীতে অনুবাদ শেষ করি।

এই অনুবাদ কর্মটি সুচারুরুপে সম্পন্ন করার জন্য আমার মুর্শিদ কেবলা সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) এঁর কাছে আর্জি পেশ করি। তাঁর দোয়া, মেহেরবাণী ও সুনজরের কারণে এই দুর্বোধ্য গ্রন্থটিকে একটি অনুবাদ কাঠামোয় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর তদারকি, গাইডলাইন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যারা এই গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, মাইজভাণ্ডারী গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর এবং পীর ভাই অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভুঁইয়া প্রমুখ।

গ্রন্থটির কিছু অংশ অনুবাদে আমার পীর ভাই হাফেজ মওলানা আবু মুছা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পীর ভাই মোহাম্মদ সোহেল চৌধুরীর প্রতি। কেননা তিনি আমার হাতের লেখা কপিগুলো দ্রুততম সময়ে টাইপ করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে অনুবাদের কাজ এগিয়ে নেওয়া এবং কম সময়ে পাবলিশিং-এ যাওয়া সহজ হয়েছে।

এই গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন তৎকালিন এই উপমহাদেশের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার গোল্ডমেডেলিস্ট। তিনি তাঁর সময়ে বাহরুল উলুম বা জ্ঞানের সাগর হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আয়নায়ে বারি' তাঁর জ্ঞানের গভীরতার স্বাক্ষ্যবহন করে। তাঁর এই গ্রন্থটি ইলমে মা'রেফতের একটি অমূল্য প্রস্রবন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে ভারতের পাটলিপুত্রা ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত অরিয়েন্টাল কলেজের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং পাটনা খানকায়ে মুনয়েমীয়ার সাজ্জাদানশীন হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফী ড. শাহ সৈয়দ শামীম উদ্দীন মুনয়েমী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) আমার সামনে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি কিছু শেয়ারের মর্মও আমাকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নিজেও উর্দু ও ফার্সি ভাষায় তেমন পারঙ্গম নই। তারপরও আমার মুর্শিদের মেহেরবাণীর ছায়া এই হীন খাদেমের উপর ছিল বলে জ্ঞানের স্বল্প পুঁজি নিয়ে হিম্মত করে এগিয়ে গেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে যখন সমস্যার সম্মুখীন হতাম তখন তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করে এই কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছি এবং কঠিন বিষয়গুলোও মোটামোটি বুঝতে সক্ষম হয়েছি।

আমি নিজে স্বীকার করছি যে, আমার জ্ঞানের পুঁজি কম সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ অনুবাদ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। তাই জ্ঞানী-গুণী ও সুধীমহলের প্রতি একান্ত অনুরোধ যদি আমার অনুবাদে কোন ত্রুটি খুঁজে পান তা সংশোধনে সাহায্য করেন তাহলে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব।

এই গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আরো যারা সহযোগিতা করেছিলেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তম্মধ্যে আমার পীর ভাই ব্যাংকার মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ নাজমুল হুদা, শেখ শাকিল মাহমুদ ও মওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদের কাজে আমার পরিবারের সাপোর্ট ও সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই মুনিব যেন আমার স্ত্রী জয়নব সিদ্দীকা, কন্যা আরেফীন সিদ্দিকা ও ছেলে মুহাম্মদ সাদমান সাবিরকে এই মহান কাজের গোলামীতে শামিল করে নেন এই প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে সুধী পাঠক মহল এই গ্রন্থটি অধ্যয়নে শরীয়ত ও তরিকতের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে।

মোহাম্মদ আলী আছগর
নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২৮ মার্চ ২০২৪ ইংরেজি, ১৭ রমজান ১৪৪৫ হিজরি, বুধবার

সমস্ত প্রশংসা ও ক্ষমতা আল্লাহর জন্য। কেননা এই গ্রন্থটি হাকিকতের খনি এবং আশেকদের বন্ধু ও আ'রেফদের প্রেমাস্পদদের গুপ্ত রহস্যের ধনাগার, গুপ্ত রহস্যের প্রকাশস্থল ও গোপন রহস্যাদি প্রকাশকারী। এটির নামকরণ করা হয়েছে-

"আয়নায়ে বারি

ফি

তরজমাতি গাউছিল্লাহিল আজম

মাইজভাণ্ডারী "

প্রণয়নে- যুগের মনসুর, প্রাণতুল্য আশেক, ইসলামী আইন বিশারদ, মা'রেফতের খনি, তরিকত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, হাকিকতের জ্ঞান বিশারদ জনাব ফয়জে ইনতেসাব মওলানা আবুল বরকাত মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল গণি (কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু) কাঞ্চনপুরী, ফটিকছড়ি, ইসলামবাদী, বাংলাদেশ (হে আল্লাহ! তাঁর রূহানী ফয়েজকে আমাদের সাহায্যকারী করে দিন)।

প্রথম প্রকাশক :

অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা শাহ্ ছুফী মওলানা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় প্রকাশক :

দরওজায়ে অছিয়ে গাউছুল আজম আলহাজ্ব মওলানা শাহ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকের পূর্বাভাষ বা মুখবন্দ (মূল কিতাব)

বেরাদরানে ইসলাম, উক্ত কেতাবটির সম্বন্ধে কয়েকটি জরুরি কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি। আমার দাদাজান কেবলা হযরত **গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)** ছাহেবের প্রধানতম শিষ্যগণের মধ্যে উক্ত কেতাবের লিখক মরহুম মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী ছাহেব হজরতের অতি প্রিয় শিষ্য বা খলিফা ছিলেন। হজরত কেবলা তাঁহাকে স্নেহ করিয়া "মকবুল" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি হজরতের মর্জিমতে উক্ত কেতাব খানি লিখিয়াছেন। তাহাতে হজরতের বেলায়তের দরজা, মরতবা, কেরামত এবং খোছুছিয়াতে খাচ্ছা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৌহীদ ও তাছাওফের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। **বিশেষ করিয়া তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর বিষয়ে যাবতীয় মছায়েলা মছায়েল কোরান, হাদিছ, এজমা, কেয়াছ এবং পূর্ববর্তি তরিকাদির তফছীল দিয়া খোলাছা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উক্ত কেতাব পাঠ করিলে মাইজভাণ্ডারী তরিকা সম্বন্ধে যে ভুল বুঝাবুঝি হইতেছে তাহা সম্পুর্ণ দূরীভূত হইবে এবং তৌহিদ ও তাছাওফ সম্বন্ধে একটি নুতন আলোক প্রাপ্ত হইবে। খাছ করিয়া মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের জন্য ইহা একটি অমোঘ উপকারী কেতাব।** অনেক চেষ্টার পর মওলানা ছাহেবের ছেলে হইতে মরহুমের হাতের লিখিত আসল কপি খানি লইয়া পাঠান্তে অনুভব করিলাম যে, বর্তমান সময় উক্ত কেতাবের অত্যন্ত গুরুত্ব ও আবশ্যকতা আছে। তাই উক্ত কেতাব ছাপাইয়া আপনাদের খেদমতে পেশ করিলাম। আশা করি প্রত্যেক খোদা প্রেমিক, তৌহিদ তত্ত্ববিদগণ এবং আশেকানে ভাণ্ডারী উক্ত কেতাব পাঠ করিয়া প্রচারান্তে খোদা প্রাপ্তির সহজ পথ হাছেল করতঃ আমার উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক করার সহায়তা করিয়া কৃতার্থ বাধিত করিবেন। প্রত্যেক মুসলমানের দিল তৌহিদের নূরে আলোকিত হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার দরবারে পাকে এলতেজা করিতেছি। গাউছে মাইজভাণ্ডারীর ফয়েজ তছরোফাত আপনাদের উপর বর্ষিত হউক। আমিন। ইতি-

আরজগুজার -
খাদেমুল ফোকরা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
(গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পুত্রের পুত্র-নাতী,
সাজ্জাদা নশীন, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দ্বিতীয় প্রকাশকের কথা (মূল কিতাব)

ছুফী সভ্যতার আলোকে প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের কেতাব **"আয়নায়ে বারী ফী তারজুমাতি গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী"** (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবন চরিত্রে আল্লাহ দর্পন), যাহা বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত **মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)** এঁর জাতে মোবারককে কেন্দ্র করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, তাঁহার রূহানী বিরাটত্বকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মাইজভাণ্ডারীর মহান তরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা ও এলমে তাছাউফ্ বা ছুফীবাদের বহু জটিল বিষয়াদি আলোচিত হওয়াতে এই কেতাব খানির মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কারণে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের ও মাইজভাণ্ডারী তরীকার শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব, সোলতানুল আউলিয়া, সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ ছুফী **সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)** ছাহেব উক্ত কেতাবের লিখক বাহরুল উলুম মুফতিয়ে আজম সুপ্রসিদ্ধ অলীয়ে কামেল হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর শুভ সাহচর্য ও ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আল্লামা **সৈয়দ আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রঃ)** ছাহেবের ছেলে হযরত মওলানা মুফ্তী **সৈয়দ ফদ্লুল বারী (রঃ)** এর নিকট হইতে এই কিতাবের মূল কপি নিয়া প্রকাশ করিয়া আশেকানের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব ঐক্য, ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি, মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততম সাধনা, দৃশ্যমান নাছুত জগতের প্রেরণা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকৃতি, রূহে-ইনছানী এবং নফ্ছে ইনছানীর প্রভাবকেন্দ্র কলবে ইনছানীতে কিভাবে প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত– ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা সম্বলিত হওয়ার কারণে এই কেতাবের চাহিদা

বর্তমান যুগে বেশি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের পীর মশায়েখ ও আলেম ওলামাগণ অনেকে এই কেতাবখানা তালাস করিতেছে, তাহাদের আগ্রহকে স্বাগত জানাইয়া **আমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত একমাত্র সাজ্জাদা নশীন হিসাবে** এই মহান শরাফতওয়ালার দরবারে আগত সর্বস্তরের আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও জায়েরীনগণের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই কেতাব খানি পুনঃপ্রকাশ করিয়া উপস্থিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিলাম। আশাকরি এই কেতাবটি উচ্চ শ্রেণীর তরীকত পন্থীর জন্য বিশেষ উপকারে আসিবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁহার পেয়ারা হাবিব ছরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও গাউছে মাইজভাণ্ডারীর ফয়েজ বরকত হাছিল করিয়া সকলের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সর্বাত্মক বরকতময় করুক। "আমিন "

ইতি -

দরওয়াজায়ে অছিয়ে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদা নশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, থানা : ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম , বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাগীতি	২৭
০২	রাসুলে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা-	২৮
০৩	গ্রন্থকার পরিচিতি	৩০
০৪	গ্রন্থ প্রণয়নের ভূমিকা	৩০
০৫	ভূমিকা প্রসঙ্গ : এতে সাতটি ফরতু (রশ্মি) রয়েছে প্রথম ফরতু : বেলায়তের অর্থ, প্রকারভেদ এবং আউলিয়া কেরামদের (রাহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্তর সম্পর্কে বর্ণনা	৩৬
০৬	দ্বিতীয় ফরতু : অলিদের পরিচয় এবং তাঁদের সাথে দুনিয়াদারদের শত্রুতা প্রসঙ্গ।	৪০
০৭	তৃতীয় ফরতু : 'যুগের বিবর্তনে এমন একজন অলি জগতে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে জগত স্থিতিশীল থাকে'- এই বিষয়ের বর্ণনা।	৫৪
০৮	চতুর্থ ফরতু : জ্ঞানের প্রকারভেদ ও আলেমদের পরিচয় প্রসঙ্গ	৬১
০৯	পঞ্চম ফরতু : 'ব্যক্তি কোন স্তরে পৌঁছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা ও নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম) ওয়ারিস হন'-এই বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে	৭০
১০	ষষ্ঠ ফরতু : 'প্রতিনিধিত্বের (খেলাফত) মিথ্যা দাবিদার শয়তানের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়'- এই বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে	৮০
১১	সপ্তম ফরতু : দুনিয়াদারদের পথভ্রষ্টতার কারণ প্রসঙ্গ	৮৪
১২	প্রথম জলওয়া : হযরত গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু এঁর জীবন চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গ এবং এতে সাতটি ফরতু রয়েছে। প্রথম ফরতু : হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্মের রহস্যপূর্ণ স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গ	৮৯
১৩	দ্বিতীয় ফরতু : হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরকতময় জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গ	১১৫
১৪	চট্টগ্রাম শরীফ ও সম্মানিত শহর	১১৬
১৫	মাইজভাণ্ডার শরীফের পবিত্র মাটির বর্ণনা	১১৭

১৬	ক্বিয়াম (দণ্ডায়মান) অবস্থায় সালাম পেশ	১২২
১৭	ক্বিয়াম অবস্থায় আরবী কবিতা পাঠ	১২৪
১৮	জন্ম তারিখ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে গজল	১২৫
১৯	জন্ম বৃত্তান্ত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনে অপর গজল	১২৬
২০	তৃতীয় ফরতু : হযরতের মোবারক নামের আলোচনা এবং স্তন্য পানের সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গ	১২৭
২১	গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণীসমূহ	১৩২
২২	চতুর্থ ফরতু : হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রকাশ্য জ্ঞান অর্জন, কিতাবাদি অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের বর্ণনা প্রসঙ্গ	১৪৪
২৩	সুস্পষ্ট উপকারিতা	১৪৯
২৪	পঞ্চম ফরতুঃ তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক এবং কতেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুমহান অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে	১৫৭
২৫	ষষ্ঠ ফরতু : হযরত গাউছিয়ত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কতেক কারামত বর্ণনা প্রসঙ্গ	১৬৪
২৬	এক ব্যক্তির মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে রেহাই পাওয়া	১৭৩
২৭	জনাব শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেম সাহেব	১৮১
২৮	একজন হিন্দু পান বিক্রেতার বর্ণনা	১৮৩
২৯	একজন প্রসিদ্ধ অলির বেলায়ত ছিনিত হওয়ার বর্ণনা	১৮৬
৩০	একজন ব্যক্তির বাঘের পাঞ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার বর্ণনা	১৮৯
৩১	একজন ব্যক্তির বিষধর সাপ থেকে রেহাই পাওয়ার বর্ণনা	১৯১
৩২	ধুরং খালের গতিপথ হালদা নদীর গতিপথের দিকে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা	১৯২
৩৩	প্রয়োজনের সময় হাদিয়া পৌঁছার বর্ণনা	১৯৭
৩৪	একব্যক্তির বাঘের পাঞ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার বর্ণনা	১৯৯
৩৫	জনাব মৌলভী আব্দুল গণি ছাহেবের মৃত্যু থেকে এক সপ্তাহ অবকাশ পাওয়ার বর্ণনা	২০২
৩৬	মোনাজাত	২০৪
৩৭	জনাব মৌলভী রহিম উল্লাহ ছাহেব সাগর ডুবি থেকে মুক্তি	

	পাওয়ার বর্ণনা	২০৬
৩৮	একজন বাগদাদী লোক	২০৮
৩৯	মৌলভী রহিম উল্লাহ ছাহেবের রোগ মুক্তির বর্ণনা	২১৬
৪০	একজন কারামতধারী অলির বেলায়ত ছিনিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা	২১৮
৪১	হযরত গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খাদ্যে বরকতের বর্ণনা	২২০
৪২	দূরারোগ্য বক্ষব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ	২২২
৪৩	পোকামাকড় বা খেঁকশিয়ালের আক্রমন থেকে আঁখ ক্ষেত রক্ষা	২২৩
৪৪	সুফি নুরুজ্জামান বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার বর্ণনা	২২৫
৪৫	হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পরও ভক্তের জ্বরের খবর নেওয়ার বর্ণনা	২২৭
৪৬	সপ্তম ফরতু : হযরত গাউছুছ ছাকলাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বেছাল শরীফের বর্ণনা	২২৯
৪৭	যোহরের সময় গোসলের কার্যক্রম	২৫১
৪৮	হুজুর পুর নুরের (ক.) জানাজা	২৫২
৪৯	দ্বিতীয় জলওয়া : সুলুকের কতেক মকাম (স্তর) সমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গ, এতে সাতটি ফরতু আছে। প্রথম ফরতু : ছয় প্রকার তানাযযুলাত এবং তৌহিদের মর্মার্থ বর্ণনা	২৫৪
৫০	দ্বিতীয় ফরতু : ইশকের (প্রেম) বর্ণনা প্রসঙ্গ	২৯৫
৫১	তৃতীয় ফরতু : কতেক ইশক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা	৩১৮
৫২	যখন এই রহস্য ছেমাকারীদের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়	৩৩০
৫৩	চতুর্থ ফরতু : তিন প্রকার নফ্সের বর্ণনা	৩৪২
৫৪	পঞ্চম ফরতু : পীরে কামেল তালাশের বর্ণনা	৩৫৪
৫৫	ষষ্ঠ ফরতু : পীরের সাথে রাবেতা (সম্পর্ক) ও নিসবত (সম্বন্ধ) সম্পর্কে বর্ণনা	৩৭৬
৫৬	সপ্তম ফরতু : পীর ও মুরীদের আদব সমূহ প্রসঙ্গ	৩৮৬
৫৭	বারেকা (চমক): কিতাবের সমাপ্তি-এতে সাতটি ফরতু রয়েছে। প্রথম ফরতু : পীরের শুভ অন্তর্দৃষ্টিতে সিজদায়ে	

	তাহিয়্যা প্রসঙ্গে	৩৯৩
৫৮	দ্বিতীয় ফরতু : মুরীদের তিনটি অবস্থার বর্ণনা	৪৩২
৫৯	তৃতীয় ফরতু : সুলুকের সাতটি মকামের র্বণনা	৪৪০
৬০	চতুর্থ ফরতু : নিসবতের বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৪৯
৬১	পঞ্চম ফরতু: ১৪টি সুফি সম্প্রদায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৫৭
৬২	ষষ্ঠ ফরতু : শরীয়ত ও তরিকতের বর্ণনা প্রসঙ্গে	৪৬৫
৬৩	সপ্তম ফরতু : শজরায়ে আলিয়া এবং কিতাবের সমাপ্তি প্রসঙ্গ	৪৭৯
৬৪	সহায়ক তথ্যসূত্র	৪৮৯

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা গীতি

জ্ঞান-বিজ্ঞান রহস্যের আধার তাঁর নামে শুরু।

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

তিনিই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, সবচেয়ে প্রকাশ্য এবং সবচেয়ে গোপনীয় এবং সবকিছু অবগত (সূরা হাদিদঃ ৩)।

স্তুতি ঐ মহান সত্তার যিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। ইহাই যথেষ্ট যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই)।

গজল

তিনি এক (আল্লাহ) প্রত্যেক দিকে তাঁর একত্ববাদের দীপ্তি বিদ্যমান-তিনিই চেহারার দীপ্তি, সমুজ্জ্বল যুগ, বহুত্বের পর্দা বিশেষ।

তিনিই প্রারম্ভ এবং সমাপ্তি, তিনিই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য -তিনিই প্রতিটি স্থানে সমুজ্জ্বল, গোপন অবগুণ্ঠনে বিদ্যমান এবং সবখানেই তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান।

তিনিই পর্দাবিহীন আনন্দ নৃত্যের উৎস ও প্রেমাস্পদদের লাজুকতা, তিনিই স্বয়ং প্রাণের স্বাক্ষী, তিনি নিষ্পাপদের জন্য রক্ষাকবচ।

তিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টির আশ্রয়স্থল- ঐ ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ পৃথিবীতে চতুর্দিকে তাঁরই দর্শন।

তিনিই প্রতিটি স্থানে নৃত্যরত, যেদিকে তুমি কান দাও প্রত্যেক দিকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের চনচন ও কুলকুল ধ্বনি শুনা যায়।

তিনিই সুন্দর ও মনোরম। প্রতিটি বর্ণ ও রঙ্গ তাঁরই বহিঃপ্রকাশ- তিনি বর্ণহীন, সমস্ত বর্ণ তাঁরই বর্ণেরই প্রতিফলন।

তিনি প্রতি নিঃশ্বাসে মকবুলের অন্তঃস্থলে পূর্ণসৌন্দর্য্যে বিকশিত- কখন প্রাণকে এরূপ নির্জনতার আস্বাদনে পূর্ণ করা হবে জানা নেই।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসাগীতি

প্রশংসা ঐ সৃষ্টির সেরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর; যিনি সুস্পষ্ট নিদর্শনের অধিকারী, মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ স্থল । আর ইহাই যথেষ্ট যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর বর্ষিত হোক সর্বোত্তম দরুদ ও সম্মান। এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপর ও তাঁর উম্মতদের মধ্যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত রহমত বর্ষিত হোক।

গজল

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র একত্ববাদের রহস্যের আধার, কেউ তাঁর এই রহস্য কি করে বুঝবে?
যদি আল্লাহ্‌র বান্দা (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বুঝেন, তাহলে কি বুঝছেন, আল্লাহ বুঝেন।
যদি পদমর্যাদা বা স্তর বিন্যাসের বিষয় বরযখের (ইহকাল-পরকাল) মাঝে না থাকত- তাহলে মুহাম্মদকে (দঃ) খোদা ও খোদাকে মুস্তাফা বুঝতে।
তিনিই শুরু, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও তিনি অপ্রকাশ্য,
এই গোপন রহস্য কেউ যদি বুঝে, তাহলে কি বুঝেছে?
তিনি সবার শুরু, তিনি সবার শেষ- প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আসীম ও অনন্ত বুঝুন।
আমি অধম আপনাকে কি বলব, তিনি কেমন গোপন খনি?
ইবাদত গুজারকারীর পোশাকে তুমি তাঁকে আল্লাহ্‌র জ্যোতি মনে কর।
তিনি একত্ববাদের জ্যোতির বিকাশমান মহাসাগরে একক ও অদ্বিতীয়,
উভয় জাহানকে তুমি উক্ত মহাসাগরের পানি বিন্দু মনে কর।
যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর সত্তা নিত্য সূর্য হয়,
উভয় জগতকে তাঁর সূর্যময় সত্তার একটি প্রতিবিম্ব মনে কর।
অধম মকবুলের কাছে, খোদা ও মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে পৃথক হতে পারে?
আর যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্তাকে খোদা থেকে আলাদা মনে করে, সে কি কখনও উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা লাভকারী হবে?

সর্বোত্তম কথা এই যে, কলমের ভাষাকে এই অসম্ভব ধারণা পোষণ থেকে ভেঙ্গে ফেল অর্থাৎ সাহসী ঘোড়ার লাগামকে এরূপ লতাপাতা বিহীন বিজন প্রান্তর থেকে অর্থাৎ প্রশংসাগীতি থেকে ফিরিয়ে নাও, এই অন্তহীন মরু প্রান্তর অত্যন্ত দূরবর্তী যে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাও। আর আমি অপরাধ স্বীকার করছি যে, (হে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি যেভাবে আপনার

প্রশংসা করেছেন, আমি সেইভাবে আপনার প্রশংসা করতে অক্ষম। কেননা ঐ চির বসন্তের বুলবুলি পাখির অবস্থা শোচনীয়। নিম্নোক্ত সংগীতটি অনুনয় বিনয় সহকারে পরিবেশিত। এতদ্প্রসংগে উল্লেখযোগ্য- العجز عن درك الادر اك ادراك অর্থাৎ যদি বান্দা স্বীকার করে যে, সে আল্লাহ্র রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাহলে সে তার প্রভুর ব্যাপারে সচেতন। অর্থাৎ আল্লাহ্র রহস্য বুঝতে অক্ষম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন- বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও (সূরা কাহফ, আয়াত- ১০৯)।

গজল

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
গুণকীর্তন লিখার শক্তি কোথায়?
এই ক্ষেত্রে লিখার স্থান সংকীর্ণ ও কলম পরাভূত।
যেখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা গণনা করতে পারি না।
অথচ তিনি আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী এবং অনারবদের মধ্যেও
সুস্পষ্ট ভাষার অধিকারী ও সর্বাধিক অলংকারপূর্ণ।
রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার
ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন,
সেক্ষেত্রে হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্সালাম) এঁরও নিঃশ্বাস ফেলার শক্তি ছিল না।
যেক্ষেত্রে ফেরেশতাদেরও কথা হল যে, এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।
যে স্থানে জ্ঞানীদেরও পদচারণা চলে না।
অশেষ অজ্ঞতা, অপারগতা ও অজ্ঞানতা সহকারে,
এখন আমি মকবুল আপনার প্রশংসা করার ক্ষেত্রে এখানে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস
কিভাবে ফেলতে পারি?

গ্রন্থকার পরিচিতি

অধম গুনাহগার আবুল বারকাত মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল গণি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন; যিনি অভাবমুক্ত, তাঁকে (সৈয়দ আব্দুল গণি) অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে ধন্য করেছেন। অতঃপর মকবুল হিসেবে সম্মানিত করেছেন। দেশগতভাবে তিনি ইসলামাবাদী, হানফী মাযহাবের অনুসারী এবং ক্বাদেরী মশরবের অধিকারী। পিতার নাম হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব; আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রহমত করুন, উত্তম স্থান দান করুন, প্রতিদান ও পুরস্কারের আবাসস্থলে সমৃদ্ধিতে বাস করুন। ধুরুং এর অধিবাসী, থানা ফটিকছড়ি, কাঞ্চনপুর গ্রামের নবাগত অধিবাসী। আল্লাহ তাঁকে ফিতনা ও মন্দ থেকে রক্ষা করুন। আমি তাঁর পায়ের ধুলি এবং গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের কুকুর হই।

গ্রন্থ প্রণয়নের ভূমিকা

উক্ত কিতাবটি লিখার প্রারম্ভে ধর্মীয় ভাইদের বরকতময় খেদমতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে উল্লেখ করছি যে, আমি গাউছে পাকের পায়ের ধুলি হই এবং তাঁর সাহচার্য প্রাপ্ত। বিভিন্ন সময় (মাঝে মাঝে) স্বীয় অক্ষমতা ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও ছাহেবে লওলাক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর হাবিব সুলতানদের সুলতান রূহ সমূহের আ'রেফ, খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত, আল্লাহ্‌র সম্মানিত খলিফা; যিনি পৃথিবীতে গাউছুল আজম উপাধীধারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু); যাঁর খেদমতে আমি নিয়োজিত, কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করার বাসনা জাগে।

তাঁর মহান খেদমতে কয়েকবার গোপনে অন্তরে সিজদাবনত অবস্থায় আর্জিও করেছিলাম, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাস্তবায়নে তাঁর সুমহান দরবারের পক্ষ থেকে অনুমতির ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইনি। যেহেতু এই অধমের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ছিল যে, এই রহমত ও ফয়জ বর্ষনের দরবার থেকে কোন ব্যক্তি তাঁর বাঞ্ছিত প্রার্থনা থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ফিরে আসে না। ইহার উপর ভিত্তি করে, এই অধম সর্বদা এই বিষয়ের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশায় ছিলাম। শেষ পর্যন্ত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল। যখন তাঁর সাহায্যের মহান সমুদ্র আন্দোলিত হল এবং হুজুর; যিনি ফয়েজের খনি, পথিকের আশ্রয়স্থল, কামিলদের সুলতান, প্রেমিকদের ইমাম, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলিফা জনাব হযরত মওলানা শাহ সৈয়দ গোলাম রহমান ছাহেব কেবলা (আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর ফয়জের ছায়া বিরাজমান রাখুন) এই মহান কাজে গাউছে পাকের অনুমতির ইঙ্গিত

পেয়ে এই অধমকে ধন্য করেন এবং খোদার কাছে এই বান্দা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরই মধ্যে হযরত হুজুর; যিনি পূর্ণাঙ্গ ফয়জের অধিকারী, যমানার পীরদের পীর, প্রেমিকদের রূহ ও ইমাম, মওলানা শাহ সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াদ্দীন ছাহেব কেবলা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং আমরা আস্তানাবাসীদের কাঁচের হৃদয় শারীরিক ও মানসিক বিচ্ছেদে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হিংসুটে চোখে সময় সেখানে থেমে থাকেনি। তাছাড়া এই সত্য কিয়ামত তূল্য ঘটনাটি হযরত গাউছুল্লাহিল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র খেদমতের সৌভাগ্য প্রাপ্তদের শোকে মুহ্যমান করে দিল। ইহা সমগ্র পৃথিবীকে শোকের মাতমে ভাসিয়ে দিল। আনন্দের গলগল শব্দ উর্ধজগত অর্থাৎ আর্শ, কুরসি ও লা-মকানকে শুনিয়ে দিল। যার কারণে এই গ্রন্থটির খসড়া তৈরি ও লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব হয়ে গেল। কেননা এই মুহূর্তে দরবারে পাকের কোন অবস্থা লিপিবদ্ধ করতে কলমের ভাষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার অবস্থা। আর এই হৃদয়বিদারক রহস্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনার ভাষাও ভীত ও অপারগ। সুতরাং এই মহান কাজে (গ্রন্থ প্রণয়ন) সাহস করা যেন স্পর্ধা দেখানোর মত এবং এই পথে ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেন বেয়াদবীর মত। তারপরও যখন অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তিকে হুকুম করা হল তখন না লিখার কি উপায় আছে? এই বিরহ ও বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলছি, চোখের পানি এখন প্রশান্তি, এই মহান কাজে কি উপায় আছে?

মসনবী

আপনার স্মরণ সর্বোত্তম শরাব (পানীয়)
উহা ছাড়া অন্য সব মরীচিকা।
ফুল ঝরে গিয়ে ফুল বাগান এখন বিনষ্ট হয়ে গেল,
এখন গোলাপ ফুল থেকে ফুলের সুগন্ধি খুঁজে বেড়াই।
একদিন মজনু মরু প্রান্তরে বসে বসে বলছিলেন,
লায়লার বিরহে পেরেশান হয়ে বসে রই।
বালিকে কাগজ বানিয়ে আঙ্গুলকে কলম বানিয়ে
লায়লার পবিত্র নাম লিখতে লাগলাম।
লোকেরা যখন তাঁকে দেখে তখন তারা জিজ্ঞেস করে এই বলে যে,
হে লায়লার প্রেমের স্মরণে শহীদ!
বালির প্রান্তরে তুমি এটি কি লিখতেছ?
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তুমি সদা এই কি লিখতেছ?
বিরহের তরবারি দ্বারা নিহত ব্যক্তি উত্তরে বলেন,
লায়লার বিচ্ছেদে এই অবস্থা।

অনেক দিন ধরে বিচ্ছেদে দগ্ধ হচ্ছি,
লায়লার বিচ্ছেদে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।
লায়লার সাথে সাক্ষাতের কোন পথ দেখি না,
লায়লার বিচ্ছেদে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।
তাই লায়লার পবিত্র নাম জপছি,
ইহা দ্বারা আমি আমার অন্তরকে প্রশান্তি দিচ্ছি।
হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্সালাম) এঁর চোখ হযরত ইউছুফ
(আলাইহিস্সালাম) এঁর বিচ্ছেদে,
তাঁর বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদকে তালাশে ব্যাকুল।
যদিও হযরত ইউছুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর কাপড় তখনও তাঁর (হযরত
ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম) নসীব হয়নি।
কিন্তু হযরত ইউছুফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর কাপড়ের সুগন্ধি তাঁর চিকিৎসক
পরিগণিত হল।
লায়লার নাম জপে আমার হৃদয় মৃত্যুর সম্মুখীন,
লায়লার স্মরণে মৃত্যুই হল ঈমানের পরিচায়ক।
লায়লাকে ভুলে যাওয়া প্রাণের জন্য কুফরি সমতুল্য,
কুফরি বেশের প্রাণ সর্প সদৃশ।
হে হক পন্থীদের ইমাম! হে উম্মতদের গাউছুল আজম,
মকবুল এর উপর শুভ দৃষ্টি যেন কমতি না ঘটে।

ইহার উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা লিপিবদ্ধ করে বর্ণনা করতেছি এবং ইহা দ্বারা নিজের হৃদয় এবং প্রিয় সাথীদের হৃদয়ে প্রশান্তি বর্ষণের চেষ্টা করছি। কেননা প্রেমাস্পদের আলোচনা প্রেমিকের জন্য প্রশান্তির কারণ। বরং ইহা প্রেমিকদের জন্য মৌলিক ঈমানের পরিচায়ক। কেননা আল্লাহ্র বাণী- "জেনে রাখ! আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে (সূরা রা'দঃ ২৮)। এই বিষয়টির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হল এবং পবিত্র হাদিস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সে যেন তাঁর স্মরণ বেশি করে। উক্ত বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষনের উপায়। আর ইহা অসীম কল্যাণ ও বরকত অর্জনের কারণ। কেননা বর্ণিত আছে যে- পূন্যবানদের স্মরণ করলে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। ইহা উপরোক্ত বিষয়ে স্বাক্ষী। ইহা ছাড়া অন্য সব কিছু দরিদ্রতা এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা বাদশাহী।

কবিতাংশ

আমি বললাম, সম্পদ কী? তিনি বললেন, হে বন্ধু! ফকিরিপনা।
আমি বললাম, ফকিরী কী? তিনি বললেন, বোঝাকে হালকা করা।
আমি বললাম, জ্ঞানীদের আলোচনায় কোন বিষয় বেশী সুন্দর?
তিনি বললেন, তাঁর (প্রেমাস্পদ) সব গুণাবলীর দিকে মনোযোগ দেওয়া।

তাঁর গুণাবলী সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত গুণাবলীর বিষয় আসা দরকার এবং তাঁর ভালবাসায় প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে জান-দিল বিসর্জন দিতে এসেছি।

গজল

মুখের ভিতর থেকে গাউছে পাকের যেই নাম বের হয়,
সেই সুমহান মর্যাদাবান ও জালালিয়তের অধিকারীর পক্ষ থেকে মারহাবাই (অভিনন্দন) বের হয়।
হযরতের নাম বের হওয়া যেন তুর পাহাড়ে খোদায়ী তাজাল্লী বর্ষণ হয়,
তখন প্রশংসা প্রকাশকারী চোখগুলো থেকে সূরমার অনুরূপ বস্তু বের কেন হবে না?
কলমের অগ্রভাগের শব্দ শুনে ফেরেশতাদের দল নৃত্যরত অজ্‌দ অবস্থায় উক্ত কলমকে চুম্বন করার জন্য বের হয়।
দরজা ও প্রাচীর যা কিছু আছে আদব সহকারে মাথা নত করে,
সমাবেশে কখনও যে গুণকীর্তন হয় উহা গাউছে খোদারই নাম বের হয়।
যেখানে গাউছে খোদার পবিত্র আলোচনা হয়,
তাহলে সুনিশ্চিতভাবে ওখানে খোদার রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।
যেখানে হযরতের আলোচনা হয় তথায় দোয়া কবুল হয়,
যখন তাঁর গুণকীর্তন বর্ণনার সময় কারো অন্তর থেকে যে কোন প্রার্থনা বের হয়।
হযরতের মাহফিলে ফেরেশতাগণ সদা সুগন্ধিতে পূর্ণ হয়ে যায়,
তাহলে উক্ত সমাবেশ থেকে কস্তুরী যুক্ত সুগন্ধি কেন বের হবে না?
নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরতের আলোচনা সমাবেশে আগ্রহী,
তাহলে এই মাহফিল কেন ঈর্ষণীয় হবেন না? যেখান থেকে আল্লাহ্‌র রেজামন্দির বাগান সৃষ্টি হয়।
আমার কাছে রক্ষিত সব কিছু মেশক-আম্বরের সুগন্ধিপূর্ণ তুবা (বেহেশতের একটি গাছের নাম) নামক কলম।
আর যা কিছু উক্ত কলমের ভিতর থেকে বের হয়, তা লাওহে মাহফুজে লিখিত তাঁর গুণাবলীই বের হয়।
হযরতের সেই প্রশংসাগীতি আমার হৃদয়ের অজিফা,
যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান থাকে, তবে আমার অন্তরের সেই অবস্থা প্রকাশ হবে।
যেই পবিত্র নাম আমার প্রাণের অজিফা তা যেন বিস্মৃত না হয়,

তাহলে বুঝে নাও যে, তবে আমার ঈমানের স্বাদ প্রকাশ পায়।
যখনই আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা এই পৃথিবীতে পূর্ণতা পাবে,
তবে আপনার নামের প্রেমে নিজ থেকে অভিনন্দন বের হবে।
যখন আমার প্রাণপাখি পিঞ্জর ছেড়ে বের হবে, তখন আপনার কাছে প্রার্থনা
তখন যেন গাউছুল্লাহ, গাউছুল্লাহ শব্দ আমার মুখ থেকে বের হয়।
হে গাউছুল্লাহিল আজম! আমার প্রাণের পাখি যখন বের হবে,
তখন আমার হৃদয়ের এই কামনা যে, আপনার দিদারের আকাঙ্খা প্রকাশ পায়।
যদি একটি মুহূর্ত আপনার দিদারের দৌলত বা সৌভাগ্য নসীব হয়,
তবে হৃদয়ের গোপন রহস্য; যা দুই ধনুকের ব্যবধান বা আরও কম এবং
যেখানে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি-ইহাই বের হয়।
আপনি আমার সঙ্গী হয়ে যান, ব্যাকুল মকবুল কৌতুহলবশত আপনার শূন্যতার
(লা-মকান) দেশে চলে গেল।

যদিও ক্ষুদ্র কোন গ্রহের সীমাহীন এই আলোক দানকারী পৃথিবীর সূর্যের গুণকীর্তন বর্ণনা করার কোন শক্তি নেই। পানির বুদ্বুদ শব্দের সমুদ্রের তলদেশের খোঁজ নেওয়া কোনভাবেই সঙ্গত নয়। অতএব, সেইভাবে শক্তিহীন ক্ষুদ্রকণার আলো প্রকুতপক্ষে সেই সূর্যের আলোরই শক্তি। এবং নড়াচড়া ও পানির বুদ্বুদ শব্দের স্থিতিশীলতা প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের পানির স্থিরতা বা উত্তলতার উপর নির্ভর করে। বাস্তবে, এই বিদ্যহীন ; যে কোন কিছুই জানে না, যা কিছু এতে আছে তা, এই পবিত্র বাণীর "তাঁকে দেওয়া হয়েছে জাওয়ামেউল কালিম"- ধনভাণ্ডার থেকে আমার অন্তরে এসেছে, তা রেফারেন্স স্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছি। আর যা কিছু এই ধনভাণ্ডারের মালিক-যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- "এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না, ইহা তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা নাজম, আয়াত ৩-৪)। এই আয়াতের বরকতে এই অধমের বক্ষদেশে প্রদান করা হয়েছে। আর তা আমি লিখেছি। যেহেতু এই লিখাতে বাস্তবে অবাস্তবে ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে কোন অল্প সমঝদার ব্যক্তি তার বুঝার অক্ষমতার কারণে যদি সমালোচনা করে তাহলে এই হাদিসের আলোকে-"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর সংবাদ পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।" এই রহস্যপূর্ণ অর্থবিশিষ্ট মহা সমুদ্রেরই সমালোচনা করার নামান্তর।

যদি বলা হয় কণা পরিমাণ অতঃপর তা হল বিশাল,
তবে উহা সূর্যের সুস্পষ্ট আলোক রশ্মি।
ঐ বুদ্বুদ শব্দের নড়াচড়া সমুদ্র থেকেই উত্থিত,

ইহা সমুদ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?
বংশী বাদক থেকে ঐ বাঁশির সুর আসে,
সুস্পষ্টভাবে উক্ত বাঁশির সূর প্রাণ হরণকারী।
দেহের নড়াচড়া উহা হল প্রাণের নড়াচড়ার কারণে,
যদিও বাহ্যিকভাবে শরীরের নড়াচড়া মনে হয়।
তিনি প্রেমিকদের হৃদয় হরণ করেন,
যদিও এই অপরাধী শুধু মাত্র তাঁর একজন প্রেমিক হই।
অপরের অজুহাত না খুঁজে নিজে নিজে কাজ কর,
প্রকৃতপক্ষে প্রেমাস্পদের এই নিদর্শন জেনে রাখ।
কুরআনের তাফসীরসমূহ খুলে দেখ,
ওমা ইয়ান্তিকু (وما ينطق অর্থাৎ তিনি স্বীয় কামনা-বাসনা অনুযায়ী মনগড়া কথা বলেন না।) আয়াতে বর্ণিত।
জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে উৎস তা মানবীয় সৌন্দর্য্যে নিহিত।
এই অর্থটি সে বুঝুক প্রাণপণে, যা তোমার চোখ ও ভ্রু উভয়টি স্বাক্ষী।
হাদিসে কুদসি 'মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য' উহার বর্ণনা হিসেবে যথেষ্ট।
দুঃখ ভারাক্রান্ত কলম, মকবুল তুমি আঁকড়ে ধর।
কেননা আমি দেখতেছি কলমের দুইটি মুখ রয়েছে।

যেহেতু এই সমস্ত পবিত্র কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে গাউছিয়তের প্রদীপের আলোকরশ্মি, সেই জন্য ইহা এক লুমআ' (চমক) এবং দুই জুল (ফুল) এবং এক বারেকা (আলোকছটা)-এ বিন্যস্ত করে 'আয়নায়ে বারি ফি তরজুমাতে গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)' নামকরণ করেছি।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে ইহার মাধ্যমে ফায়দা দান করুক। আর ইহাকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অসিলা করে দিন, আর তিনি (আল্লাহ) দাতা, মালিক, দয়ালু ও অতিশয় দয়াবান।

আর আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করছি,
তিনি হলেন ফযিলতপূর্ণ এবং চির বিদ্যমান।
তাঁর কাছে তাওফিক চাই, এবং আরম্ভ করার শক্তি কামনা করি এবং
তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন স্থল এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই আশ্রয়স্থল।

লুমআ' (চমক)- ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং এতে সাতটি ফরতু (রশ্মি) রয়েছে। প্রথম ফরতু (রশ্মি)- বেলায়তের আভিধানিক অর্থ ও এর প্রকারভেদ এবং আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্তর বিন্যাসের বর্ণনা

প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত ইরফানি (মা'রফত) রহস্য এবং আল্লাহ্‌র গোপন রহস্যের প্রসঙ্গে এই অংশটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পেশ করে যে, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা সমস্ত দোষ ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র এবং তাঁর সুমহান দরবার সুউচ্চ যা আকল (বুদ্ধি) ও ধারণার বাইরে। তাঁর বাদশাহী এবং জালালাত (মাহাত্ম্য) অনিত্যের গ্রাস থেকে মুক্ত এবং তাঁর কুদরত ও হিকমত সমালোচনা থেকে মুক্ত। প্রত্যেক প্রকার গুণাবলী তাঁর জন্য বৈধ উপমা। সবকিছুর উৎস পবিত্র সত্তার পূত:পবিত্র সত্তা ও একত্ববাদের আবশ্যকতা নিয়ে বিরাজমান। তিনি কেমন সত্য উপাস্য এবং সবার বিচারক; যিনি সাত আসমানকে রঙ্গিন তাঁবু স্তম্ভ ও দড়ি ব্যতিত স্থাপন করেন এবং যমীনের স্তরকে পানির স্তরের উপর বিছিয়ে দিয়ে মাওয়ালিদে ছালাছা (স্থুল জগতের প্রেরণাজনিত ত্রিবিধ জড় ধর্মে প্রভাবান্বিত বুদ্ধি) দ্বারা আবাদ করেছেন। শুধুমাত্র স্বীয় পরিচিতি ও ইবাদতের জন্য নিম্নোক্ত বাণী মতে- 'আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য'। জ্বীন ও মানবকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। বিশেষ করে বনি আদমকে সম্মানের চাদর দ্বারা আবৃত করে তাকে প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ ও সমবেদনা জ্ঞাপনকারী হিসেবে নিম্নোক্ত বাণীর হকদার- "এবং আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি" হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। খোদার প্রেমাগ্নিতে দহন ও সমবেদনা প্রকাশকারী হিসেবে আদম (আলাইহিস্‌সালাম) সন্তানদের মরতবা উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাদের উপর দ্বিগুন উঁচু করে দিলেন।

মসনবী

ফেরেশতাদের ইশ্‌ক (প্রেম) ছিল, কিন্তু বিরহ-বেদনার অংশ ছিল না,
বিরহ-বেদনার জন্যই খোদা মানব সৃষ্টি করেন।
এক অনু পরিমাণ ইশ্‌ক (প্রেম) সমস্ত জগত থেকে উত্তম মনে কর,
এক অনু পরিমাণ বিরহ-বেদনা সমস্ত প্রেমিকদের থেকে শ্রেষ্ট মনে কর।

অতঃপর তাদের মধ্যে পয়গাম্বরদেরকে দৃঢ়প্রত্যয়ী পথ প্রদর্শক হিসেবে সৃষ্টি করে পৃথিবীর হেদায়তের ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা তাঁদের উপর সমর্পন করলেন এবং জনাব সুমহান সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সনদুল আসফিয়া উভয় জগতের সুলতান উভয় জগতের রাসুল আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর নুরানী আবির্ভাবকে ঈমান বিদ্যমানের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করলেন এবং তাঁর ধর্মকে অন্য সব ধর্মের রহিতকারী হিসেবে সাব্যস্ত করলেন এবং তাঁর পরিবারকে সর্বোত্তম পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সর্বোত্তম আসহাব উপাধি প্রদান করে দ্বীনে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা তাঁকে সমর্পন করেন।

অতঃপর হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও আল্লাহ ওয়ালা আউলিয়াগণ সৃষ্টি করেন। তাতে ইসলামের ভিত্তি আরো মজবুত হল এবং ঈমানের সিলসিলা সুদৃঢ় হল। তাঁদের প্রত্যেক আকাশের সূর্যের সদৃশ হেদায়তকারী এবং তাঁদের পুষ্পতুল্য হেদায়তের অগ্রযাত্রার পদভারের বরকতে আসমান ও জমীন কায়েম আছে। তাঁদের হিম্মত (সাহস) ও সাহায্যের কারণে পৃথিবীর কার্যের ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। প্রত্যেক যুগে একলক্ষ চব্বিশ হাজার আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বিশ্ব জগতে বিদ্যমান থাকেন।

'নফহাতুল উনস' কিতাবে মওলানা জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেছেন যে, তম্মধ্যে চার হাজার জন মকতুম; যাঁরা একে অপরকে চিনেন না। আর এই সমস্ত ওলিরা তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথাও অবগত নন। প্রত্যেক অবস্থায় নিজেকে অপর সৃষ্টজীব থেকে গোপন করে রাখেন। এই ব্যাপারে অনেক হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। আর এই ব্যাপারে আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বিভিন্ন উক্তিও বিদ্যমান রয়েছে। সমস্যার সমাধানকারী, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং আল্লাহর প্রতাপশালী দরবারের উচ্চ স্তরের আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ৩০০ জন; তাঁদেরকে আখবার বলা হয়। তম্মধ্যে ৪০ জনকে আবদাল বলা হয় ও সাতজনকে আবরার নামে আখ্যায়িত করা হয়। চারজনকে আওতাদ বলা হয় এবং তিনজনকে আতকিয়া বলা হয়। একজনকে কুতুব ও গাউছ বলা হয়। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনেন। পৃথিবীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় একে অপরের অনুমতির মুখাপেক্ষী। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদিস সমূহে এই ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মগজুল মা'আনি' ও 'তারিখে ফেরেশতা' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) চারটি স্তর রয়েছে, সেগুলো হল-(১) চুগরা, (২) কুবরা, (৩) ওসতা ও (৪) ওজমা। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকের হেদায়তের যোগ্যতা মধ্যমানের ও উচ্চমানের হয়ে থাকে। ঐ স্তরের আউলিয়াগণ কোন যুগে ৩৫৬ থেকে কম হন না। সুফিয়া কেরামগণ তাঁদের মধ্য থেকে ৩০০ জনকে আবতাল বলেন এবং চল্লিশ জনকে আবদাল বলেন।

সাত জনকে সিয়াহ নামে আখ্যায়িত করেন এবং পাঁচ জনকে আওতাদ নামকরণ করেন। তিনজনকে কুতুবুল আওতাদ হিসেবে গণ্য করেন। আর একজনকে কুতুবুল আক্তাব এবং গাউছ হিসেবে জানেন। যদি তাঁদের উক্ত সংখ্যায় কোন একজন কম থাকেন, অন্য একজন তাঁদের নিম্ন স্তর থেকে উক্ত পদে স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্য থেকে নয়জন ব্যতিত অন্য কেউ হেদায়ত করার যোগ্যতা রাখেন না। তম্মধ্যে পাঁচ জন আওতাদ, তিনজন আক্তাব এবং একজন কুতুবুল আক্তাব। এখন জেনে রাখা প্রয়োজন যে, 'বেলায়ত' (ولايت) শব্দটি ওয়াও বর্ণ যের সহকারে দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম প্রকার হল বেলায়তে ঈমান, যাকে বেলায়তে আম্মাও বলা হয়। ইহা সাধারণ মুমিনদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন' (সূরা বাকারাঃ ২৫৭) আয়াতটি সেই দিকে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় প্রকার হল- বেলায়তে ইহসান; যাকে বেলায়তে খাস্সাও বলা হয়। এই বেলায়তের মধ্যে খাস (বিশেষ), সর্বাধিক খাস এবং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা অন্তর্ভূক্ত । আর বেলায়তে খাস্সার অধিকারী আল্লাহ'তে বিনাশ (ফানা) প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে বাক্বা অর্জনকারী ব্যক্তিকে বলা হয়। আর ফানা বলা হয় সায়ের ইলাল্লাহকে (আল্লাহর দিকে বান্দার গতি)। বাক্বা বলা হয় সায়ের ফিল্লাহ (আল্লাহতে বান্দার গতি) এর মাধ্যমে হেদায়ত অর্জনকারী। কেননা সায়ের ইলাল্লাহ (আল্লাহ্র দিকে বান্দার গতি) ঐ সময় পূর্ণতা পায় যখন নিজ অস্তিত্ব ও হাস্তিকে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠ ও সত্যতার সাথে বিলীন করে দিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। আর ইহা তিন প্রকার ফানা (বিনাশ) ব্যতিত সম্ভব নয়, সেগুলো হল- খাল্ক, হাওয়া, ইরাদা। তাই ইহার বর্ণনা সামনে আসতেছে।

আর সায়ের ফিল্লাহ ঐ সময় অর্জিত হয়, যখন ফানায়ে মোত্লাক (সাধারণ ফানা) অর্জন করার পর সাদাসিধে অন্তরের অধিকারী এবং সর্বপ্রকার নাপাকী, অপবিত্রতা থেকে পবিত্র সত্তা অর্জন করার মাধ্যমে। যার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত এবং তাঁর চরিত্রে চরিতার্থ হয়ে উন্নতি অর্জন করেন। এই বেলায়তে খাস্সাকে খাস মুমিনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেলায়তে ছোগরা বলা হয় এবং আম্বিয়া ইজাম (আলাইহিস্সালাম) এঁর দৃষ্টিকোণ থেকে বেলায়তে কুবরা বলা হয় এবং ফেরেশতাগণের দৃষ্টিকোন থেকে ইহাকে বেলায়তে ওলইয়া নামকরণ করা হয়। জেনে রাখা চাই যে, অলি (ولى) শব্দটি ফয়িল (فعيل) শব্দের ওজনে বা ছন্দে হয়ে থাকে। আর ফয়িল (فعيل) শব্দটি কখনো ফায়েল (فاعل) বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য হিসেবে সিফতে মোবালেগা (আধিক্য অর্থ প্রদানকারী বিশেষণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো

মাফউল (مفعول) বা কর্মবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থের আলোকে ইহার অর্থ হল- অনেক নৈকট্য অর্জনকারী ও নৈকট্যের অধিকারী। এতদ্‌বিষয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি ইঙ্গিতবহ, আল্লাহ্‌র বাণী- "হে আমার প্রভূ! আমাকে বেশি বেশি জ্ঞান দান করুন" (সূরা ত্বাহাঃ ১১৪)। আর বিশেষণ তাঁদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থারই প্রতিফলন। আর দ্বিতীয় অর্থের আলোকে অর্থ হল- নৈকট্য প্রদান করা হয়েছে এবং নৈকট্য প্রাপ্ত। এতদ্‌প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি ইঙ্গিতবহ, আল্লাহ্‌র বাণী "তিনি সৎকর্মশীলদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন" (সূরা আ'রাফঃ ১৯৬)।

অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বয়ং সৎকর্মশীল বান্দাহদের বন্দেগীর বদৌলতে তিনি তাদেরকে অধিকার সমপন্ন করেছেন এবং তিনি তাঁদের অভিভাবক ও যামিনদার। একটি মুহূর্ত ও একটি নির্ঘন্টও তিনি তাঁদের সত্তাকে ছেড়ে যান না। আর এই বিশেষণটি কামেলীন মুকাম্মেলীন (পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পূর্ণতাদানকারী) এর বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই দু'টি গুণ বা বিশেষণ অলিদের হওয়া আবশ্যক। অতঃপর যে ব্যক্তি অলি হবেন তিনি বেলায়ত (ولايت) (ওয়াও বর্ণ যের যোগে) এবং ওলায়ত (ولايت) (ওয়াও বর্ণ যবর যোগে) উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'বেলায়ত' ওয়াও বর্ণ যের যোগে বিষয়টি ইতিমধ্যে জানা গেছে। আর 'ওলায়ত' (ওয়াও বর্ণ যবর যোগে) ঐ বেলায়তকে বলে, কামিল মুকাম্মিল অলি স্বীয় মুরিদকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন এবং তরিকতের আদব শিক্ষা দেন। সারমর্ম এই যে, যা কিছু অলি এবং সৃষ্টি জীবের মাঝে হয়ে থাকে তাকে 'ওলায়ত' (ওয়াও বর্ণ যবর যোগে) বলা হয়। আর যে সমস্ত বিষয় অলি এবং আল্লাহর মাঝে হয়ে থাকে তাকে 'বেলায়ত' (ওয়াও বর্ণ যের যোগে) বলা হয়। 'বেলায়ত' (ওয়াও বর্ণ যের যোগে) এর অধিকারী অলি তাঁর বেলায়ত ইহধাম ত্যাগ করার সময় সাথে নিয়ে যান। আর 'ওলায়ত' (ওয়াও বর্ণ যবর যোগে) এর অধিকারী অলি ইহধাম ত্যাগের সময় উক্ত বেলায়ত অন্য কাউকে সমর্পন করে যান। যাই হোক, উক্ত বিষয়টি হযরত জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) "নফহাতুল উন্‌স" কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় ফরতু (রশ্মি) : অলির পরিচয় এবং তাঁদের সাথে দুনিয়াবাসীদের শত্রুতা প্রসঙ্গ

প্রকাশ থাকে যে, নিম্নোক্ত হাদিস কুদসীতে আল্লাহ ইরশাদ করেন "আউলিয়াগণ আমার বুজুর্গীর ছাদরের নিচে থাকেন, আমি ছাড়া তাঁদের কেউ চিনেন না"। উক্ত হাদিসে কুদসীর মর্মার্থের আলোকে আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এঁর পরিচয় জানা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি একজন অলি অপর অলিকে চেনাও কষ্টকর। তাহলে সাধারণের এই ব্যাপারে কি শক্তি আছে যে, সেখানে তারা নিঃশ্বাস ফেলবে? তাছাড়া আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) দুনিয়াবাসীদের নিকট থেকে সর্বদা দূরে থাকেন এবং দুনিয়াবাসীও আহলুল্লাহ (আল্লাহ ওয়ালা) থেকে সর্বদা দূরে সরে থাকে। তাই উক্ত মর্মার্থটি আল্লাহ তায়ালা সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন- "ওরা বলল, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে" (সূরা ইয়াসীন : ১৮)।

মসনবী

অহির (প্রত্যাদেশ) সুগন্ধি দ্বারা যে পথভ্রষ্ট ও পথহারা হল,
কেবলই তারা বলবে, "আমরা তোমাদের অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি।"
তোমাদের কথায় আমাদের দুঃখ হয়,
আর তোমাদের ওয়াজ (উপদেশ) তো কেবলই অশুভ লক্ষণ।
যদি তোমরা রেসালতের প্রচারে বিরত না হও,
তোমাদেরকে আমরা পাথর নিক্ষেপ করব।
খেল তামাশা করা আমাদের কাজ, উক্ত রিসালত প্রচারে কোথায় স্বস্তি আছে?
বিবেকের (আকল) চিকিৎসা যে ব্যক্তি আফিম দ্বারা করল,
নিশ্চিতভাবে উহা রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিল।

কেননা দুনিয়াদারদের মগজ ও অন্তর আউলিয়া আল্লাহদের বাণী ও ফয়েজ গ্রহণের শক্তি নাই। তাই এই ব্যাপারে বক্স নির্মাতার কাহিনী উল্লেখযোগ্য, যে বাজারের মধ্যে আতরের সুগন্ধি পেয়ে বেহুশ হয়ে গেল, যা অত্যন্ত পুরাতন একটি ব্যাপার। হযরত জনাব মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) আস্সাম ঐ কাহিনীকে দুনিয়াদারদের ব্যাপারে নিম্মোক্ত শেয়ার গুলোতে উল্লেখ করেন। তা হলো-

মসনবী

একদা একজন বক্স নির্মাতা বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার জন্য গেল।
ঘটনাক্রমে সে হঠাৎ বাজারের মধ্যে আতরের (সুগন্ধি) দোকানের পাশদিয়ে
অতিক্রম করল।
আতরের সুগন্ধি যখন তার মস্তিষ্কে পৌঁছল,
তখন সে মাথা ঘুরে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।
সে মৃত প্রাণীর মত বেহুশ হয়ে পড়ে রইল,
তখন লেকেরা এসে তার গলা বাঁধল ।
কেউ তার বক্ষ ও মাথা মালিশ করছিল,
আবার কেউ মন্ত্র পড়ে ঝাড় ফুঁক করছিল।
কেউ ভেজা মাটি তার মাথায় দিচ্ছিল,
কেউ তার নাড়ি ও রগে হাত রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করল।
কেউ নিভৃতে চন্দন কাঠের ধূপ দিচ্ছিল,
কেউ গিয়ে তার পরিধেয়কে আলগা করছিল ।
কেউ গিয়ে তার মুখের ঘ্রাণ নিচ্ছিল,
আর বলছিল যে, সে তো মদ ও গাঁজা খায়নি।
কেউ তার নাকের ডগায় গিয়ে বলছিল,
তাকে গোলাপ, আতর, মেশক-আম্বর (কস্তুরী) ও আজফর সুগন্ধি লাগাও।
সেই জানে না এগুলোর সুগন্ধি কেমন,
কেনই বা এই বেচারা বেহুশ হয়ে পড়ল।
কেউ জানে না যে, তার কি মৃগী রোগ হল,
এখানে কিভাবে সে বেহুশ হয়ে পড়ে রইল?
দ্রুত তার নিজের ভাইকে খবর দেয়া হল,
বলা হল, অমুক বেহুশ হয়ে নাজুক অবস্থায় পড়ে আছে।
বক্স নির্মাতার অত্যন্ত সচেতন এক ভাই ছিল,
সে তাড়াতাড়ি আসল।
সে (ভাই) তার হাতায় কুকুরের মল নিয়ে ভীড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে পৌঁছল,
সেই বলল, আমি প্রথমে জানতে চাই তার রোগ কি?
কেননা রোগের কারণ জানা প্রথম কাজ।
যেই রোগের কারণ জানে তার জন্য ঔষধ সহজ হয়ে যায়,
আর যে রোগের কারণ জানে না তার জন্য ঔষধ কঠিন হয়ে যায়।
সে (ভাই) মনে মনে ভাবল যে,
তার স্বভাব-প্রকৃতি সর্বদা দুর্গন্ধের সাথে অভ্যস্ত।

সেই রাত-দিন দুর্গন্ধের মধ্যে বসবাস করে,
তাই সে এখানে সুগন্ধি পেয়ে বেহুশ হয়ে গেল।
দুর্গন্ধের সাথে তার বসবাসের অভ্যাস ছিল,
আতরের সুগন্ধি তাকে বরবাদ করে দিল।
বিজ্ঞজনদের ইহা কতই উত্তম মত যে,
অভ্যাসের বিপরীত বস্তু দুঃখ বা পেরেশানি বয়ে আনে।
বক্স নির্মাতা গোবরের ডিবিতে বসবাস করত,
আতরের সুগন্ধি দ্বারা তার বেহুশি আসল।
দুঃশ্চরিত্র পুরুষের জন্য দুশ্চরিত্রা রমনী হয়ে থাকে,
কোরআন মজিদে এই কথাটি ইরশাদ হয়েছে, তা দেখ।
সে (ভাই) লোকজনকে সরিয়ে সেখানে এসে পড়ল,
যাতে মল দ্বারা চিকিৎসা সেখানে গিয়ে কেউ না দেখ।
সে অপবিত্রতার (দূর্গন্ধ) ঔষধ ভাল করে পর্যবেক্ষন করল
এবং ভাইটি তার হাতায় কুকুরের মল লুকিয়ে নিল।
যখন সে সন্তর্পনে তার কানের পাশে গেল,
তখন সে তাকে ময়লার দূর্গন্ধ শুকাল।
যখন তার মস্তিষ্কে দূর্গন্ধ প্রবেশ করল,
তখন বেহুশি থেকে তার সম্বিৎ ফিরে এল।
উক্ত মৃত শরীরে হঠাৎ প্রাণ আসল,
কয়েক মুহুর্তে মৃত ছিল, এখন সে উঠে বসল।
লোকেরা বলল, তার তো আজব ব্যাপার!
তুমি কি মন্ত্র পড়েছ যার কারণে তার সম্বিৎ ফিরে এল?
মূলত: পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য পবিত্র ব্যক্তিই যথোপযুক্ত,
আর অপবিত্র ব্যক্তির জন্য অপবিত্র বক্তিই সঙ্গী ও সহকর্মী।
হে গাউছে খোদা! আপনিই আমার মালিক প্রেমাস্পদ,
আপনিই মকবুলের (গ্রন্থকার) সমস্ত গোপন রহস্য ও কাজের মালিক।

মূল কথা- দুনিয়াদারদের স্বভাব হল- তারা সবসময় আহলুল্লাহদের সংস্পর্শ থেকে দূরে পালিয়ে যায়। সত্য কথা যে, কিছু বিষয় এমন যে, যেগুলো ধারণ করার মাধ্যমে ; যে বিষয়গুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদি এই গুলোকে বেশি আবশ্যক করে নেওয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে ঐ স্বভাব আরো বেশি বেড়ে যায়। প্রথমটি হল আম্বিয়া ইজাম (আলাইহিমুস্সালাম) ও আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এর দিদার। মুমিনদের জন্য যেগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এবং

কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কুফরি ও নিফাকি বৃদ্ধির কারণ। দ্বিতীয়টি হল- আল্লাহ্‌র কালাম তেলাওয়াত, ইহাও ঈমানদারদের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়মূলক নুর (জ্যোতি) বৃদ্ধির কারণ এবং ইহা সীমালংঘনকারীর জন্য হিংসা, কুফরি ও মুনাফেকি বৃদ্ধির কারণ। এতদ্‌প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আল্লাহ্‌র বাণী উল্লেখযোগ্য- 'যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন ইহা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে' (সূরা আনফাল: ২)। অপর আয়াতটিও এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ্‌র বাণী- 'এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, উহা পাষাণ' (সূরা বাকারা: ৭৪)। এই আয়াতদ্বয় পূর্বোক্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল।

অপর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন- ' উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কতেককে পথ ভ্রষ্ট করেন এবং উহা দ্বারা কতেককে সঠিক পথ দেখান' (সূরা বাকারা: ২৬)। তৃতীয়টি হল- হারমাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা শরীফ) এঁর দিদার। ইহা সৌভাগ্যবানদের সৌভাগ্য এবং দূর্ভাগাদের দূর্ভাগ্যের কারণ। চতুর্থটি হল- ইলম (জ্ঞান), ইহা অযোগ্যদের অপূর্ণতা ও নির্বুদ্ধিতাকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং শরাফতধারী ব্যক্তিদের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেয়। ইহা নীসাঁ[১] মাসের মেঘের অনুরূপ যা বাগানে লালা সৃষ্টি করে এবং জমীনের উপরে ঘাস জন্মায়। আম্বিয়া ইজাম (আলাইহিমুস্‌সালাম) ও আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) সর্বদা আহদিয়ত (একত্ববাদ) এঁর নুরী সমুদ্রে সর্বদা ডুবে থাকেন। কুপ্রবৃত্তি দ্বারা তাঁদের গ্রেফতার হওয়া এমন ভাবা তাঁদের ব্যাপারে হাসদ (হিংসা) করার নামান্তর।

আদম (আলাইহিস্‌সালাম) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রতিভার মূল্যবান সম্পদ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন, তখন অভিশপ্ত ইবলিশ স্বীয় সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতা দ্বারা অপদস্ত হল। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সাথে আবু জাহল হিংসা করেছিল, ফলে সে নিজেকে চির স্থায়ী দূর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত করল। আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া (আলাইহিমুস্‌সালাম) ও আউলিয়া কেরামদেরকে (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণ হল- পরিশুদ্ধকামী, ওফাদার ও হিংসুটে, ছলনাময়ী ব্যক্তিদের মাঝে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যাতে এটা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবারে কে মকবুল (গৃহিত) এবং কে বিতাড়িত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ' ওরা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে' (সূরা সাফ্‌ফ: ৮)।

---

[১] সিরিয়া দেশে প্রচলিত ৭ম মাস বিশেষ (অনুবাদক)।

গজল

পৃথিবীর বাঁধন তোমার বাঁধনে আটকা,
আউলিয়া কামেলীনগণ এই বাঁধনে নিরন্তর আটকা রয়েছেন।
খোদার বন্ধনই মজবুত ও শক্তিশালী,
অপরদিকে মাছি তাড়ানো কুকুরদের [দুনিয়াদার আলেম] বন্ধন প্রতারণা ও অক্ষমতায় পূর্ণ।
খোদার প্রদীপ হল চন্দ্রবৎ উজ্জ্বল চেহারা সদৃশ,
যদি তুমি তার দিকে মূর্খতা বশতঃ থুতু নিক্ষেপ কর তা তোমার দিকে পড়বে।
আপনার দ্বারে রয়েছে আলো এবং এই প্রাঙ্গনে রয়েছে সম্মান,
আর কুকুরের বাচ্চারা (দুনিয়াদার আলেম) প্রতিহিংসা পরায়ণ বশতঃ আউ আউ করে।
আপনার মকবুল (গ্রন্থকার) কাল্লাসের [টিকটিকির চাইতেও বড় রক্তচোষা প্রাণী বিশেষ] মত
সমুজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তাঁর বাহুতে যেন শক্ত হাতে আঁকড়ে থাকে।

অর্থাৎ কবি স্বীয় মুরশিদে কামেল এবং কামিল পথ প্রদর্শককে সম্বোধন করে বলেন যে, হে হযরত! আপনার মাহবুবী শান, প্রেমময়তা, হেদায়ত ও পথ প্রদর্শন এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে। আর পৃথিবীর সিংহপুরুষগণ অর্থাৎ খোদার বান্দাহদের বিষয়বস্তু হল কামিল আউলিয়াদের কেন্দ্র করে। স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাস আপনার খেদমতের মাধ্যমে পূর্ণ করে এবং গোলামীর চিহ্ন ললাটে দৃশ্যমান রাখে।

কবিতাংশ

প্রেমাস্পদতার যে শর্ত ছিল তোমাতেই তা শেষ হল,
যতই প্রেমাস্পদ রয়েছে সবাই তোমার প্রিয় আঙ্গিনায় এসে হয়রান ও পেরেশান।
খোদার রাজ্যে প্রেমাস্পদতার আজ যে পূর্ণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে,
হে আমার প্রিয়! সবার মস্তক তোমার কদমে অবনত।

আপনার প্রেমময় বন্ধনে যে সমস্ত খোদার বান্দারা আবদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার উপর স্বীয় জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছেন; মূলত ইহা খোদায়ী বন্ধন যেটি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। আর ইহার সুদৃঢ়তা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, খোদার সিংহ পুরুষরা তাতে আটকা পড়েছে। পূর্বোক্ত শেয়ারে 'সাগমাগস' (মাছি তাড়ানো কুকুর) দ্বারা দুরিয়াদার আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা শক্তিশালী ধর্মের সম্পদকে পার্থিব ময়লাযুক্ত তুচ্ছ থুতুর বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় এবং পরকালকে দুনিয়ার ভালোবাসায় ডুবিয়ে দেয়। রাতদিন আট প্রহর দুনিয়াদারদের সাথে ভালোবাসা ও মহব্বত রাখে; যারা কুকুরের মত

দুনিয়ার মৃত প্রাণীর প্রতি নিবিষ্ট। মাছি তাড়ানো কুকুরের মত দুনিয়াদারদেরকে চৌধুরী সাহেব, মুন্সী সাহেব এবং নওয়াব সাহেব এইরূপ অন্যান্য উপাধি দ্বারা সম্বোধন করে দৌড়ে গিয়ে টাকা পয়সা হাসিলে মত্ত থাকে। যেন নিম্নোক্ত আয়াত তাদের শানে অতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়নি' (সূরা বাকারা: ১৬)। কিভাবে তারা ঐ খোদায়ী শক্তিশালী বন্ধন ছিন্ন করবে?

হযরত (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পবিত্র বরকতময় সত্তা খোদার আলোকদানকারী প্রদীপ। তাঁর হেদায়ত, ইরফান ও ইরশাদ দ্বারা সমগ্র জাহান আলোকিত হচ্ছে। তাঁরই ওসিলায় সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা দূরীভূত হয়ে হিদায়ত ও ইরফানের রাজপথে পৌঁছতেছে। অতঃপর খোদায়ি মোমবাতিকে যে মুর্খ স্বীয় ফুৎকার দ্বারা নিভাতে চেষ্টা করে এবং হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের নুর (জ্যোতি) কে যে মিটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, সে নিতান্ত নির্বোধ এবং নিকৃষ্ট স্তরের মুর্খ। কেননা যেই মোমবাতিকে আল্লাহ তায়ালা উজ্জ্বল করেছেন এবং খোদায়ী ইচ্ছা অনুযায়ী আলোকিত হয়েছে, উহা কখনও নিভে যাবে না। বরং ঐ সমস্ত মূর্খ তাদের খারাপ ও বাতিল চিন্তা- ভাবনা দ্বারা নিজেদেরকে অপমানিত ও ধ্বংস করতেছে। এইরূপ শত্রুতা পোষণ দ্বারা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতার কিনারায় পতিত করছে। কেননা আউলিয়া কেরামদের সাথে হিংসার ফলে শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা উহা থেকে ক্ষমা করুন।

কবিতা

খোদার প্রদীপকে তুমি উজ্জ্বল দেখতে পাবে,
উহার উপর যদি তুমি থুতু নিক্ষেপ কর তা তোমার দিকেই পড়বে।

অতঃপর হযরত এঁর 'হেদায়ত' ও 'ইরশাদ' হল সম্মানিত আসমানের চৌদ্দতম তারিখের চাঁদের মত; যা অত্যন্ত শক্তিশালী ও আলোকময় জ্যোতি বর্ষণকারী ফয়েজ বর্ষণের মত। দুনিয়াবাসী ও দুনিয়াদার আলেম তাঁর সুমহান মর্তবা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং তাঁর ক্ষমতা ও সুউচ্চ স্তর চিনে না। সেজন্য তারা প্রতিহিংসা পরায়ণবশত কুকুরের বাচ্চার মত আউলিয়াদের সাথে আউ আউ করতেছে। অতঃপর হে মকবুল! তুমি সূর্য উপাসক গিরগিটির মত ঐ হেদায়তের সূর্যের দিকে জান-প্রাণ দিয়ে উৎসর্গ হও এবং সমস্ত পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী হতে পৃথক হয়ে তাঁর প্রেমময় বাহুতে আঁকড়ে থাক। কেননা ইহাই প্রকৃত ঈমান এবং বিশ্বাসের সারবস্তু।

কবিতাংশ

জান প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গ, তুমি কেমন দ্বারের অধিবাসী!

অভিমান কেন করব না? কেননা যার প্রিয়তম হলে তুমি।
সৃষ্টির মধ্যে তোমার সৌন্দর্য্যের ধুম কেন পড়বে না?
সৌন্দর্য্যের বাগিচায় তুমিই অনন্য ফুল বাগান।

সারকথা এই যে, আউলিয়া কেরামদের সাথে দুনিয়াদারদের শত্রুতা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসতেছে। খোদার বন্ধুগণ জান-প্রাণ দিয়ে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন।

গজল

জগতে আমি যেই চেহারা দেখেছি তা কিভাবে বর্ণনা করব?
ঐ নুরী চেহারার সৌন্দর্য কিভাবে আমি বর্ণনা করব?
উহা কেমন উজ্জল চেহারা; যেটি অতুলনীয় ও অনুপম,
উহা নির্দোষ ও নিষ্কলুষ চেহারা; যেটি বুদ্ধি ও কল্পনার ধারণায় কিভাবে বর্ণনা করবে?
কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে এই অতুলনীয় ও অনুপম চেহারার কিছু নমুনা বর্ণনা কর,
তখন আমি বলে দিব, উহা নমুনাহীন ও অতুলনীয়। কিভাবে তুলনার মধ্যে ইহা আনা যায়?
তিনি হচ্ছেন লা-মকানের প্রাণপাখি এবং লা-মকানের দিকে উডডয়নকারী,
আর যিনি লা-মকানের প্রাণপাখি তাঁকে কিভাবে মকান (স্থান) এর সাথে বিশেষিত করা যাবে?
যদি কেউ একত্ববাদের শরাব পান করে সীমা থেকে বের হয়ে যায়,
তিনি কিভাবে সসীম হবেন? বেশ! তাঁকে কিভাবে সসীম গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যাবে?
হে বন্ধু! একত্ববাদের শরাব পানে আশেকগণ সর্বদা সুউচ্চ প্রেরণার অধিকারী,
অন্যান্য আশেকদের মন্দ অনুপ্রেরণাকে কিভাবে বিশেষিত করবে?
শক্তিমান ব্যক্তি শক্তি দ্বারা বিবেচিত হয়। আর একত্ববাদের লড়াকুরা আশেক কুস্তিগীর,
অপরাপর দূর্বল ও খোঁড়া কুস্তিগীরদের মধ্যে কিভাবে গণ্য করবে?
আশেকদের তুলনায় দুনিয়াদাররা নাপাক ও অপবিত্র হয়ে থাকে,
বেশ! শয়তান ফেরেশতাদের মধ্যে কিভাবে শামিল হতে পারে?
যদি বাগানের বুলবুলি পাখির অবস্থান ফুলের ডালে হয়ে থাকে,
তাহলে মৃতদেহ খেঁকো দাঁড় কাক বুলবুলি পাখির মধ্যে কি করতে পারে?
শিয়ালবৎ মকবুল (গ্রন্থকার) কখন সিংহের মধ্যে গণ্য হবে?
যে অপরিচিত বা দূরের সে কিভাবে নিকটাত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হবে?

যদি মেনে নেওয়া হয় যে, যদি কেউ তাঁদের চিনিতে চায়, তাহলে কিভাবে চিনবে? অন্ধ চোখে ঐ সূর্যের আলোকে কিভাবে পরিমাপ করবে?

সুবহানাল্লাহ, যেই হযরতবৃন্দ ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ এর অধিকারী, কারো কি শক্তি আছে তাঁদের স্তর ও মর্তবা স্বীয় অসম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পাল্লায় পরিমাপ করার? পর্বতকে খড় দ্বারা পরিমাপ করা অত্যন্ত বোকামী। সুউচ্চ আসমানকে পাল্লা দ্বারা ওজন করা অতীব মূর্খতা।

কবিতাংশ

প্রাণপাখির কণ্ঠধ্বনি পবিত্র ব্যক্তিদের কতেককে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে,
রাজকীয় মকামের দাঁড় কাকগুলো তা খোঁজ করা শুরু করে দিয়েছে।
হে বাধ্য প্রাণপাখি! স্বীয় নফ্সের ব্যথা-বেদনা তুমি শ্রবণ কর,
উড্ডয়নের সুস্পষ্ট সর্বোচ্চ সীমার বৃত্তে তুমি প্রদক্ষিণ কর।

এখন প্রকাশ হয়ে গেল যে, আউলিয়া কেরাগণের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) পরিচিতি অসম্ভব বিষয়। কিন্ত তা সত্ত্বেও, যেহেতু পৃথিবীর কার্যাদির ব্যবস্থাপনা ও হেদায়তের কার্যাদি ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবের বিষয়াদি হযরত আউলিয়া কেরাগণের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বরকতময় সত্তার সাথে সম্পর্কিত। সেই কারণে জরুরী বশতঃ অনুগ্রহ ও দয়া পরবশ হয়ে সুদৃঢ় ধর্মের বুজুর্গগণ স্বয়ং নিজেরা আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) পরিচয়ের জন্য চিহ্ন ও অনুমানগত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছেন। নিম্নোক্ত বাণীর আলোকে 'যাকে পুরাপুরি বুঝা যায় না; উহাকে পুরাপুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়'। সেই কারণে তাঁদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল । প্রথম বৈশিষ্ঠ্য এই যে, বাহ্যিকভাবে শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ অবিচল ও অটল থাকা। এতদ্প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় আউলিয়াগণ তাকওয়া অবলম্বনকারী' (সূরা আনফালঃ ৩৪)। কেননা বেলায়ত ছাড়া পরিপূর্ণ তাকওয়া কল্পনা করা যায় না। আর শরীয়ত বিবিধ ধাপসমূহ সংরক্ষণ করাকে বুঝায়। উহার বর্ণনা বারেকা (আলোকছটা) অধ্যায়ে আসতেছে (ইনশা আল্লাহ)। দ্বিতীয় চিহ্ন এই যে, তাঁর খেদমতে বসার মাধ্যমে অন্তর দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়াবাসীদের ভালোবাসা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত এবং পবিত্র দরবারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। উদ্দিষ্ট মঞ্জিল তালাশকারীর কর্দমাক্ত প্রেমময় অন্তর থেকে কলুষতা বিদূরিত হয়।

কবিতাংশ

যার সাহচর্যে অন্তরের স্থিতিশীলতা আসে না,
যার সাহচর্যে জড় জগতের মায়া ছাড়া যায় না।
যার সাহচর্যে দুনিয়াকে ভুলা যায় না;
এরূপ সাহচর্যে তুমি কখনো যাবে না।

ইবনে মাজাহ, ইমাম বাগভী এবং ইমাম নববী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আউলিয়াদের আলামত (চিহ্ন) কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, যাঁদের দেখলে খোদার স্মরণ এসে যায় তিনিই অলি।

আর এই তাসির (প্রভাব) কম বেশি প্রত্যেক অলিদের মধ্যে পাওয়া যাওয়া যাওয়া উচিত। যাঁর অভ্যন্তরে এই প্রভাবটি বেশি শক্তিশালী থাকে, তিনি মুরীদকে খোদা তায়ালার প্রতি বেশি আকর্ষণ করেন এবং খোদার তায়ালার নৈকট্যের ধাপসমূহে পৌঁছিয়ে দেন। এইরূপ অলিকে মুকাম্মিল (পূর্ণতাদানকারী) বলা হয়। যেমন কামাল (পূর্ণতা) এর স্তর অনেক। অনুরূপভাবে তাকমিল (পূর্ণতা দান করা) এর অনেক ধাপ রয়েছে। কতেক আউলিয়া স্বীয় কামালিয়াতে প্রাধান্য রাখেন এবং তাকমিল এর ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব রাখেন না। কিন্তু স্বীয় ধাপ পর্যন্ত অন্যকে পৌঁছাতে পারেন। উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া । তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, অলিগণ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী ও মোহহীন। যে অলি যতটুকু দুনিয়া ত্যাগ করেছেন তিনি ততটুকু আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনকারী।

পংক্তি

মনজিলে মকসুদের সাথে তোমার সম্পর্ক ছিল,
এই সম্পর্কের অন্তরায়গুলিকে তুমি ছেড়ে দাও,
তাহলে সফল হবে।

কেননা আউলিয়া দুই প্রকার। যথা: তাইয়ারাহ ও সাইয়ারাহ। 'তাইয়ারাহ' ঐ অলিদেরকে বলা হয়, যাঁরা পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াবী সম্পর্ক ত্যাগ করে মোশোহাদা (খোদার দর্শন) স্তরে উপনীত হয়েছেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারের সুমহান ফেরেশতাদের সাথে উড়তে থাকেন। যেমন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- 'আমি জাফর বিন আবু তালিবকে দেখেছি, তিনি তাঁর দুই পাখার সাহায্যে বেহেশতে ফেরেশতাদের সাথে উড়তেছেন'। 'সাইয়েরাহ' ঐ অলিকে বলা হয়, যিনি কিছু পরিমাণ দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত, তবে তিনি দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড ত্যাগ ও উড্ডয়ন আকাংখী। তাঁদের ও উড্ডয়নকারীদের এক প্রকার যেমন সম্পর্ক রয়েছে। তদ্রুপ যদি তিনি কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত না হয়, তাহলে তাঁর খারাপ পরিণতির আশংকা রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহা থেকে রক্ষা করুন এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল- ফেরেশতা ও

উর্ধ্বালোক বরং সমস্ত খোদায়ী জগতের সব বস্তু তাঁকে এবং তাঁর নামকে সম্মান ও সমীহ পোষণ করে।

বর্ণিত আছে যে, যেই সময় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব মূর্তি সমূহের ঘরে গমন করতেন এবং নবুওয়তে মোহাম্মদীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নুরের ঝলকানি যখন ঐ মূর্তি সমূহে গিয়ে পড়ত, তখন সমস্ত মূর্তিগুলো ঐ নূরের সম্মানার্থে মাথা নত করত। সেইরূপ যেই অলি কুতুবুল আলম এবং গাউছুল আজম হন, উনি নুরে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশস্থল হয়ে থাকেন। সমগ্র খোদায়ী জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যে কোন না কোনভাবে তাঁর সম্মান করে না এবং কোন না কোন পদ্ধতিতে তাঁর নাম নেয় না । যদিও মুখে তাঁর নাম নিতে না পারলেও অন্তরে তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আসল উদ্দেশ্য হল- যেইভাবে হোক, অবশ্যই তাঁর নাম মুখ, অন্তর ও প্রাণের অজিফা হওয়া চাই। কিন্তু যাদের অন্তরের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেন 'অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ আরো কঠিন হয়ে গেল', তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকারই করে থাকে। তাঁদের (আউলিয়াদের) ভালোবাসা হেদায়ত ও সঠিক পথ পাওয়ার কারণ, তাঁদের সাথে শত্রুতা পথভ্রষ্টতা ও দূর্ভাগ্যের কারণ।

গজল

ইশকের পেয়ালা থেকে আপনার প্রশংসা সঙ্গীত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বাজে,
আপনার বন্ধু এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, আপনার দুশমানরাও নিশ্চুপ হয়ে গেছে।
যাকে আপনি বিতাড়িত করেছেন সে খোদায়ী দরগাহ হতে বিতাড়িত হল,
তাঁর নিকট গৃহিত হওয়া এটি আল্লাহ্‌র নিকট গৃহিত হওয়ার দলীল।
আপনার ইশকের এক বিন্দু পানি দ্বারা আমাদের ত্রুটিগুলো ধৌত করে দিন,
তাঁর ভালবাসায় চক্ষু রক্তের অশ্রু বিন্দু বর্ষন করে।
তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষনকারী আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়ভাজন,
তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষনকারী আল্লাহর শত্রু- যে তাঁর মুরিদ হল, সে প্রভুর
দরবারে মিলন লাভ করল।
স্বীয় মস্তক যদি আমি কভু আরশ পানে উত্তোলন করি,
তবে আমার দু:খজনক পরিস্থিতির প্রতি শুভ দৃষ্টি যেন হয়।
আপনার সত্তার সর্বাধিক বিশেষত্বের কারণে, আপনার বাণী- 'আমার মুরীদ ভয় করোনা'
যখন তুমি পীরদের ইমামের মুরীদ, তখন হে 'সাফি' (অন্তরঙ্গ বন্ধু; এটি
গ্রন্থকারের উপাধি)! তোমার কিসের ভয়?

হযরত শায়খ আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী[১] (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'কিতাবুত্তাজাল্লিয়াত' গ্রন্থে লিখেন, যে সমস্ত বস্তু মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে অদৃশ্য. তার খবর পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুর কাছে কশ্‌ফ শক্তির আলোকে হাসিল থাকে। কিন্তু জিন ও মানব জাতি ব্যতিত। কেননা তাদের এই ব্যাপারে খবর থাকে না। কিন্তু অলৌকিকভাবে তাদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, তার ভিত্তিতে উদ্ভিদ সমূহ, পাথর সমূহ, জীবজন্তু সমূহ এর মধ্য থেকে কোন বস্তু বাকি থাকে না, যা নবুওয়তে রাসূল মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দৃষ্টিকোণে তাঁর খবর থাকে না।

---

[১] হযরত শায়খ আকবর আসায়েবে হসাইনী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় তাফসীরে লিখেন যে, আয়াতাংশ انّ الّذين آمنوا অর্থাৎ যে সমস্ত লোক জ্ঞানগত বা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানে হাক্বিকির সাথে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং وعملو الصالحات অর্থাৎ ভাল কাজ করেছে, যার দ্বারা পরিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা ভালভাবে অর্জিত হয়, এমনকি খারাপ গুণাবলী থেকে বের হয়ে উজ্জ্বল গুণাবলী গ্রহণকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। سيجعل لهم الرحمن ودّا অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসবেন' যেমন বর্ণিত আছে, আল্লাহ ইরশাদ করেন-'মুমিন সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্যে চলে আসে। এমনকি আমি তার বন্ধু হয়ে যাই, যখন আমি তার বন্ধু হয়ে যাই, আমি তখন তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই; যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হযে যাই; যা দ্বারা সে ধরে'। প্রকৃতপক্ষে এই ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব অনাদি কালের ফলস্বরূপ বা প্রভাব জনিত বিষয়। যেটি নিম্নোক্ত আয়াতাংশটি থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদের ভালোবাসেন, তাঁরাও তাঁকে ভালবাসেন'। কেননা যখন তাদের (মুমিন) পাপে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনার আগে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত আমলের সাথে মহব্বত তৈরি করল, তখন খোদার মহব্বত তাঁদের অন্তরে আবশ্যক করে দিলেন এবং তাঁদের পূর্বের অঙ্গিকার পূর্ণ করে দিলেন। অত:পর হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অনুসরণের কারণে তাঁদের সেই পূর্ব অঙ্গিকার তাজা হয়ে গেল। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী -'হে হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন'। ফলে আমল ও অবস্থার অনুসরণ শুদ্ধ হল, তখন মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহব্বত প্রোথিত হল; যেটি অনাদি মহব্বতের ফলাফল থেকে ঢের বেশি। তাঁর (দঃ) মহব্বত সৃষ্টিজীবের অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গেল এবং ঈমানদারদের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ পেল। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যে, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈলকে (আলাইহিস্‌সালাম) ডেকে বলেন, হে জিব্রাঈল ! নিশ্চয় আমি অমুক বান্দাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখি; তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ। অত:পর হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। অত:পর আহবানকারী আসমান বাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন, অত:পর তোমরাও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ । অতঃপর আসমানবাসী তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অত:পর তাঁর প্রতি মহব্বত জমিনবাসীদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলে জমীন বাসীরাও তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন বান্দা আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর সৎকার্য দ্বারা এগিয়ে আসলে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রহণযোগ্যতা মানুষদের অন্তরে ঢেলে দেন। আর ইহাই আল্লাহ্‌র পূর্বোক্ত বাণী-'আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করেন'- এর মমার্থ । আর আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

কতেক আবদালের বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারাও উহা বুঝা যায়। যখন তাঁরা (আবদাল) কাফ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত মহাসাগরের পাশে গেলেন, তখন তাঁরা একটি বিশাল আকৃতির সাপ দেখলেন যেটি পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে। অতঃপর তাঁরা সাপকে সালাম করল, সাপটিও সালামের উত্তর দিল। ইহার পর সাপটি আবদালগণের কাছে শায়খ আবু মাদইয়ান (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আবদালগণ বললেন, তুমি কিভাবে শায়খ আবু মাদইয়ানকে (রহমতুল্লাহে আলাইহি) চিন? অতঃপর সাপটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে, যে শায়খ আবু মাদইয়ান সম্পর্কে জানে না এবং তাঁর প্রতি মহববত রাখে না? আল্লাহ্‌র শপথ! যখন তাঁকে আল্লাহ তায়ালা অলি বানালেন, তখন আমাদের সবার অন্তরে বলে দিলেন এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর সকলের অন্তরে অবতরণ করলেন। এমনকি গাছ, পাথর, ধূলাবালি, মাটি ও পশু-পাখির মধ্যে কোন কিছু বাকি থাকে না, যে তাঁকে চিনে না এবং তাঁর মহব্বত অন্তরে ধারণ করে না। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। কথা এখানেই সমাপ্তি।

একদিন এই অধম পাপী; যার আপাদ মস্তক পাপপূর্ণ, ভ্রমণে বের হলাম। এক এলাকায় যখন পৌঁছলাম দেখলাম যে, সেখানে একটি যিয়াফত (ভোজ সভা)-এ কতেক মুর্খ আলেম পাশাপাশি বসে পরস্পরে কথা-বার্তা বলছিল। যখন তারা দূর থেকে আমাকে দেখল, তখন কতেক আওয়াম (সাধারণ) লোক ঐ গন্ড মূর্খ ওলামাদের ইঙ্গিত পেয়ে আমাকে তাদের মজলিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। তারা অনেক জোরাজুরি করল, কিন্তু আমি তাদের মজলিসে গেলাম না। জরুরী ভিত্তিতে যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম ওখানে বসে পড়লাম এবং ঐ যাহেল আলেমগণ নাম জিজ্ঞাসা করার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, আপনারা জনাব হযরত গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গাউছে আজম বলেন, তাঁর গাউছিয়তের কি নিদর্শন রয়েছে? ততক্ষণাৎ আমি উত্তর দিলাম, যিনি গাউছে যমান, খোদা ও রাসূলের খলিফা হয়ে থাকেন, তাঁর আলোচনা ও স্মরণ যেভাবেই হোক প্রত্যেক বস্তু করে থাকেন। তাঁর নামের সম্মান জ্বীন, মানব-দানব, পশু-পাখি, মাটি, বৃক্ষ, পাথর প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। তারা (গন্ড মূর্খ ওলামা) বলল, এটা কিভাবে সম্ভব? আমি বললাম, দেখ! যখন স্বীয় কৃষি জমিতে কীট আক্রমণ করে এবং অন্য কোন পশু এই গুলো খেয়ে ফেলে, তখন লোকেরা আমার হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্য নিয়াজ অন্তরে মানত করেন, তৎক্ষণাৎ তার কৃষি জমি নিরাপদ হয়ে যায় এবং কৃষিক্ষেত রক্ষা পায়।

এখন জানা গেল যে, কীট পতঙ্গ এবং চতুষ্পদ জন্তুও হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

অতঃপর দেখ, যেমন কোন ফলবান গাছে ফল ধরছে না, এই অবস্থায় হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর নামে নিয়াজ মানত করার মাধ্যমে ঐ বৃক্ষে ফল ধরে যায়। তাহলে বুঝা গেল যে, গাছও হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর নামের সম্মান করে। গাউছিয়তের যেই সমস্ত নিদর্শন সমূহ আমরা কিতাবে পড়েছিলাম তা আজ স্বচক্ষে দেখছি। অতএব, কেন তাঁকে গাউছে যমান বলব না? যখন আমি এভাবে উত্তর দিলাম, তখন তারা প্রাচীরের নকশার মত চুপচাপ হয়ে গেল এবং আমি ঐখান থেকে উঠে চলে গেলাম। এতদ্ব্যতিত একবার রমজান মাসে গাউছিয়তের দরবারের সকলের মনে মনে এ বাসনা জাগল যে, আমরা সবাই তাঁকে একবার দর্শনে সফল ও সৌভাগ্যবান হই। যখন ঈদের নামাজ পড়ানো হচ্ছিল হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই সময় ঈদগাহে জায়নামাজের উপর উপবেশন করা অবস্থায় ছিলেন। সকলের অন্তরে এই খেয়াল অতিক্রম করতে লাগল যে, যা আমরা মনে মনে চিন্তা করছিলাম। ইহা তখনই প্রকাশ হয়নি, তৎক্ষণাৎ হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখ থেকে ইরশাদ হল- 'হে বৎসরা! লোকেরা যা ভাবছে, তোমরা তা ভেবো না। নিজেদের কাজে তোমরা কেন তাড়াহুড়া করছ? আমি হলাম গাউছে জমান, আমার কাছে সবার ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সব জানা আছে'। যখন থেকে আমরা তাঁর এই বাণী শুনলাম, সবার কাছে ইহা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হল যে, হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গাউছে জমান ও রহমান এঁর খলিফা।

গজল

চেহারার অবগুণ্ঠনে এককসত্তার রহস্য লুকায়িত,
বন্ধ অবগুণ্ঠন খুলে ফেল যাতে আমি তোমার রূপ দেখতে পাই।
তোমার জুলফির কেশগুচ্ছের অছিলায় এই গরীব ফরিয়াদ জানাই,
যাতে তুমি তোমার সূর্যতুল্য চেহারার আলো দান কর।
হে প্রত্যুষের বাতাস! খোদার কাছে ফরিয়াদ পৌঁছে দাও,
যেন আমার মনো-প্রাণ তাঁকে পাওয়ার আশায় সময় অতিবাহিত করে।
আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে
তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আলোচনা বিরাজমান।
ক্ষুদ্রকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত তোমার সম্মানে
তোমার আবরু (ভ্রু) পরে সিজদা করে।
শত নামাজ ও রোজা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ,
তবে তোমার আশেকগণ তোমার ইশকের শরাবের সমুদ্রে মাতাল।

হে সুন্দর প্রেমাস্পদ! তোমার কাছে আশা যে,
আমার সারা জীবন তোমার গলির কুকুর হিসেবে আমাকে অন্তর্ভূক্ত কর।
জগতে যতদিন বেঁচে থাকি তোমার নাম ব্যতিত অন্য কারো নাম যেন না লই,
আমার প্রাণ সংহারের সময় তোমার চেহারার সৌন্দর্য্য যেন দর্শন করতে পারি।
তোমার প্রেমে আমার প্রাণ যেন তোমার কদমে সদকা করতে পারি,
তোমার ইশকের খুশিতে গজল গেয়ে যেন নাচতে পারি।
হে গাউছে মাইজভাণ্ডার! থাকি যেন আমি ধৈর্যশীল,
আমাকে দর্শন দান কর, তোমার কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।
প্রশান্তি বর্ষণকারীর মত হীন দাসের প্রতি একটি ঝলক দান কর,
সিনাই পর্বতের দহনের মত তোমার আকাঙ্খায় আমি যেন মরে যাই।
ব্যাকুল মকবুল তোমার কাছে সদা কুকু শব্দ করে কান্নারত,
বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ও মরুপ্রান্তরে তোমাকে হয়রান হয়ে খুঁজে ফিরি।
হে পৃথিবীর বাদশাহ! পার্থিব জগতের কি হল যে,
বুলবুলি পাখি তোমারই অনুপম সৌন্দর্য্যের সুঘ্রাণ তালাশ করে।

তৃতীয় ফরতু (রশ্মি) : প্রত্যেক যুগে একজন অলি পৃথিবীর স্থিতিশীলতার জন্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক- এই বিষয়ের বর্ণনা

হাদিস শরীফে এসেছে, যখন পৃথিবীতে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীবাসী পথভ্রষ্টতার কারণে খোদা ও রাসূলের মর্জির বিপরীত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে যায়। তখন আর্শ, কুরসি, আসমান, জমীন, মাটি, উদ্ভিদ, পাথর, প্রাণী, বন্য প্রাণী, পাখি ও সমগ্র সৃষ্টি জীব নিজ নিজ অবস্থা ও ভাষা দ্বারা খোদার দরবারে জমিন বাসীদের হেদায়ত করার জন্য কান্না করতে থাকে এবং বারবার কাকুতি-মিনতি ও অস্থিরতা সহকারে প্রার্থনা করতে থাকে। তখন সেই সময় আরহামুর রাহেমীন (দয়ালুদের মধ্যে অধিক দয়াবান) এঁর রহমতের সমুদ্রে উত্তেজনা বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং স্বীয় পূর্ণ রহমত ও ব্যাপক অনুগ্রহ দ্বারা তাদের প্রার্থনা কবুল করেন।

তিনি (আল্লাহ) স্বীয় কোন প্রিয় বান্দাহকে জমীনবাসীদের হেদায়তের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং তাঁর বক্ষকে হিংসা-বিদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার নিন্দনীয় চরিত্র থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেন। তাঁর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর সমূহ আলোকময় ও মা'রিফাতের নানাবিধ রহস্যাদি প্রথম ও শেষ পর্যন্ত আলোকোজ্জ্বল করে দেন। খোদায়ী রাজত্বের রহস্যাদি তাঁর বক্ষদেশে তিনি আমানত রাখেন। তাঁর (আল্লাহ) একান্ত বিশ্বস্ত বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে কুরআনের অধিকারী, শরীয়ত পালনকারী এবং হাকিকতের অধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। আর সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ ফরজ করে দেন। তাঁর অবাধ্যতাকে উভয় জাহানে ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর অনুসরণকে তাঁর সন্তুষ্টির প্রধান কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেন। আর তাঁর আনুগত্য না করা, অবমাননা, বিদ্রোহ করা তাঁর অসন্তুষ্টি এবং গযব ও আযাবের কারণ হিসেবে দেখেন। তাঁর স্মরণকে সুউচ্চ করেন এবং তাঁর ফযিলত মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ করে দেন। তাঁর সম্মান ও শান-শওকত অন্তর সমূহে বৃদ্ধি করে দেন। আর তাঁকে পৃথিবীতে তাঁর (আল্লাহ) নবী, রাসূল, খলিফা ও প্রতিনিধি মনোনীত করেন। জমীনবাসী বরং উর্ধ ও অধঃজগতের সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে হেদায়ত ও দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। তাদেরকে (সৃষ্টিকূল) সুস্পষ্ট গোমরাহী থেকে হেদায়তের রাজপথে নিয়ে

আসেন। তাঁর সীমাহীন ফয়জের বরকতে পৃথিবীকে কায়েম রাখেন। বরং সমগ্র পৃথিবী দেহ সদৃশ এবং তাঁর বরকতময় সত্তা রূহ ও প্রাণ সদৃশ। আর এই খোদায়ী খেলাফত কোন কালের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক যমানায় একজন খোদার খলিফা; যাঁর বরকতময় সত্তার অসিলায় পৃথিবী কায়েম থাকার জন্য মজুদ থাকা জরুরী। কিন্তু এতটুকু পার্থক্য, তা-হল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পূর্বে খেলাফত নবুওত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন শেষনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নবুওয়ত পরিসমাপ্তিতে রাব্বুল আলামীন বেলায়তে ওজমা এর পদবীটিকে গাউছিয়ত হিসেবে প্রসিদ্ধি দান করেন।

আবু দাউদ ও অন্যন্য হাদিস গ্রন্থে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শত বৎসরের মাথায় একজন যুগ সংস্কারক প্রেরণ করেন, যিনি উম্মতের জন্য তাঁদের ধর্মীয় বিষয়গুলোর সংস্কার সাধন করেন'। যেহেতু এই বিষয়টি হযরত আরেফ রুমি আস-সামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় মসনবী শরীফের ২য় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। আর এই অধম উহা হুবহু নকল করে পদ্য ও গদ্য আকারে অনুবাদ করে দিচ্ছি। মসনবী শরীফের পিরাহন ইউসুফীতে আছে, প্রকাশ থাকে যে, হযরত রাসূল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতদের তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। যথা: সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীন। যাহেরা আলেমগণ বলেন যে, ঐ তিন স্তরের লোকেরা অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। আর সূফিয়ায়ে কেরামগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বলে থাকেন, এই তিন স্তরের লোক কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবেন। কেননা হযরত রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথাও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে তাঁর সমান যে আমাকে জীবদ্দশায় দেখল। যেহেতু আউলিয়া কেরাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বাতেনী চোখে বা স্বপ্নে দেখে থাকেন, তাই তাঁরা হযরত ওয়াইস ক্বরনী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মত আসহাবের অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু অলিউল্লাহ প্রত্যেক যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবেন, তাই তাঁদেরকে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে থাকেন, তাই তাঁরা তাবেঈন হয়ে গেল। আর যাঁরা তাঁদের (তাবেঈন) দেখল, তাঁরা তাবে-তাবেঈন হল। এই ভাবে সমস্ত উম্মতের

লোকেরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। আর যে কেউ জনাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর স্থলাভিষিক্ত আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এঁর অস্বীকারকারী হবে, সে আরবের মুনাফিকদের মত অভিশপ্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। যেহেতু মওলানা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) গাউছ, কুতুব, আবদাল ও অন্যান্য আউলিয়াদের স্তর সমূহ আগে বর্ণনা করেছেন।

মসনবি

প্রত্যেক যমানার বিবর্তনে একজন ওলি কায়েম থাকেন
এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্ব ও বাতিলের পরীক্ষাও জারি থাকবে।

অর্থাৎ প্রত্যেক কালের বৃত্তে একজন অলি; যিনি পৃথিবীর কায়েম থাকার ওসিলা, গাউছে জমান রাসূলের খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকেন। আর হক্ব ও বাতিলের পরীক্ষাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কবিতা

অতএব, আর যুগের বিদ্যমান ও জীবিত ইমাম উক্ত অলিই হয়ে থাকেন,
চাই তিনি হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বংশধারা থেকে হোক,
চাই হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বংশধারা থেকে হোক।

অতএব, চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্বাচিত ইমাম ও খলিফা ঐ অলিই হয়ে থাকেন। আর এটা শর্ত নয় যে, তিনি সৈয়দ বংশীয় হবেন। বরং তিনি হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বংশ ধারা থেকে হলেও জায়েজ এবং সৈয়দ না হলেও হবে। যেমন তা সুস্পষ্ট।

কবিতা

হে সৎকর্মশীলগণ! মাহদী (হেদায়তকারী) ও হাদি (পথ প্রদর্শক) ঐ অলি হয়ে থাকেন,
তাঁর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কখনো গোপন থাকে, আবার কখনো প্রকাশিত হয়।

প্রত্যেক খোদা তালাশকারী ব্যক্তির জন্য পৃথিবীর পথ প্রদর্শক হিসেবে যাহের ও বাতেনীভাবে তিনিই হলেন সেই অলি, যিনি খোদার খলিফা। নিম্নোক্ত পংক্তিতে ঐ খোদার খলিফা, গাউছে হক এর বর্ননা বিদ্যমান-

তিনি হলেন আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং তাঁর আকল (বিচার বুদ্ধি) হলেন
হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম),
তাঁর নিম্ন স্তরের অলিগণ তাঁর প্রদীপ [অর্থাৎ তাঁর থেকে তাঁদের কাছে ফয়েজ পৌঁছে]।
আর যাঁরা উক্ত প্রদীপ থেকে নিম্ন স্তরের নুরের স্তর বিবেচনায়
তাঁরা আমাদের জন্য ছোট তাক স্বরূপ[১]।

অর্থাৎ তিনি খোদার পক্ষ থেকে নির্বাচিত ইমাম, সমগ্রসৃষ্টির গাউছ ও নুর (জ্যোতি) সদৃশ এবং তাঁর আকল (বিবেক-বুদ্ধি) হল হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম); যিনি পৃথিবীর কার্যাদির ব্যবস্থাপনায় তদারকি করছেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর আকল ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম)। আর যেই অলি ঐ স্তরের নিম্ন স্তরে হবেন তিনি তাঁর প্রদীপ। আর যিনি প্রদীপ থেকে নিম্ন স্তরের হবেন, তিনি হলেন মিশকাত (ছোট তাক)। অতএব আল্লাহ্র নূর স্তর বিবেচনায় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত' (সূরা নূর-৩৫)। অর্থাৎ আল্লাহ আসমান ও জমীনের নূর। ঐ নূরের উদাহরণ হল একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ। অতএব ইহা হল হাকিকতে মুহাম্মদীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নুর। হযরত রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে ঐ নুর গাউছে যমানের কাছে এসেছে। তাঁর আকল হল আক্লে কুল (পূর্নাঙ্গ আকল)। সংবাদ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনি জিব্রাঈল (আলাইহিস্সালাম) সদৃশ। আর তাঁর পরবর্তী স্তর হলেন কুতুবগণ, তাঁরা প্রদীপের মত। ঐ হাকিক্বতে নূরে মুহাম্মদী (দঃ) তাঁদের মধ্যে চমকায়। তাঁদের পরবর্তী স্তর আওতাদগণ। তাঁরা বাতির তাকের মত ঐ প্রদীপের নূর তাঁদের মধ্যে দীপ্তিমান। ইহার উপর ভিত্তি করে এইভাবে স্তরে স্তরে প্রত্যেক অলির মধ্যে ঐ নুর চমকায়।

কেননা আল্লাহ তায়ালার নুরের ৭০০ [সাত শত] পর্দা রয়েছে,
তুমি অলিদের উক্ত স্তর সমূহকে নূরের পর্দা মনে কর।

---

[১] কুতুবুল আক্তাব হলেন নূর স্বরূপ। আর যে সমস্ত অলি তাঁর থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হন তাঁরা প্রদীপ স্বরূপ। অন্যান্য অলিগণ যাঁরা তাঁদের (প্রদীপ) থেকে ফয়েজ গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা ছোট তাকের মত।

প্রত্যেক পর্দার পশ্চাতে এক একটি দলের মকাম (স্তর) রয়েছে,
তাঁদের এই পর্দা ইমাম [গাউছুল আজম বা কুতুবুল আক্তাব] পর্যন্ত সারি
সারিভাবে বিন্যস্ত।
শেষ কাতারের অলিগণ স্বীয় দূর্বলতার কারণে
তাঁদের চোখ বেশি চমকানোর শক্তি রাখে না।
আগের সারির অলিগণ তাঁদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণে
বেশি আলোক ছড়ানোর শক্তি রাখে না।
ঐ জ্যোতি যা প্রথম কাতারের অলিদের জন্য জীবনীশক্তি,
আর দূর্বল দৃষ্টিশক্তির অধিকারী অলিদের জন্য বিপদস্বরূপ।
তাঁদের দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে
যখন সাতশত পর্দা অতিক্রম করেন তখন 'আমি হলাম তিনি' হয়ে যান।

অর্থাৎ গাউছে জমান থেকে হাকিকতে নুরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত ৭০০ (সাতশত) পর্দা রয়েছে। প্রত্যেটি পর্দার অভ্যন্তরে অসংখ্য সারি সারি আউলিয়া কেরামের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) মকাম (স্তর) রয়েছে। অতঃপর শেষ কাতারে অবস্থিত অলি রুহানী শক্তির স্বল্পতার জন্য তাঁর উপরের অলিদের জ্যোতি বহন করতে পারেন না। আর যেই জ্যোতি পূর্বোক্ত মকামে অবস্থানরত অলিদের হায়াত (জীবন) হিসেবে পরিগণিত; তা পরবর্তী স্তরে অবস্থানকারী অলিদের বেলায় পেরেশানী ও জানের পরীক্ষা স্বরূপ। কেননা পূর্ববর্তী স্তর তুলনায় ইহা অধিকতর ক্ষুদ্র । ইহা দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। যখন এই ক্ষুদ্রতা, অত্যধিক অস্পষ্টতা দিন দিন কিছু কিছু কমে যায়, তখন আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করত: সাতশত পর্দা অতিক্রম করে গাউছে জমান দ্বিতীয় স্তর থেকে বের হয়ে ইমামত স্তরে উপনীত হন। তখন তিনি মা'রিফাতের মহাসমুদ্রে পরিণত হন এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁর সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়ে যায়।

যে আগুন লোহা বা স্বর্ণের জন্য উপযোগী,
তা তাজা আপেল ও সবজির জন্য কিভাবে উপযোগী হতে পারে?
আপেল ও সবজি কিছুটা রুক্ষ্ম, কিন্তু লোহা সেইরূপ নয়,
উহার জন্য হালকা গরম প্রয়োজন।
কিন্তু লোহার জন্য উক্ত শিখা হালকা,
কেননা উহা [লোহা] উত্তপ্ত ঐ শিখাগুলোকে খুবই শোষণকারী।

মওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) উক্ত আউলিয়া কেরামদের সারি বা স্তর সমূহের আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা ও দূর্বলতা সমূহ বর্ণনা করে বলেন, যে আগুণ লোহা বা স্বর্ণের জন্য উপযোগী তা ভেজা ও অপরিপক্ক আপেলের জন্য উপযোগী নয়। কেননা লোহা তীব্র আগুনের শিখা দ্বারা গরম হয় এবং আদ্র বস্তু হালকা গরম দ্বারা শুকায়। অনুরূপভাবে, যেই অলি শক্তিশালী যোগ্যতা রাখেন, তিনি অধিক শক্তিশালী খোদায়ী তজল্লী বহন করতে পারেন এবং যিনি দূর্বল যোগ্যতার অধিকারী, তিনি অত্যধিক শক্তিশালী খোদায়ী তজল্লী বহন করতে পারেন না।

যে দরবেশ মোজাহেদার ভাট্টিতে তপ্ত হন তাঁর অবস্থাও লোহার মত,
তিনি হাতুড়ি এবং আগুনের নীচে আরও লাল ও আনন্দিত।
তিনি সত্য পথ লাভের জন্য কোন মাধ্যম ছাড়া
আগুনকে নিজের শরীরে গ্রহণ করেন।
পানি ও পানি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি কোন মাধ্যম ব্যতিত আগুন দ্বারা রন্ধন করা যায় না
এবং ইহাকে কোন নামেও ডাকা যায় না [যেমন রুটি, পোলাও ইত্যাদি]।
ইহার জন্য দরকার ডেগচি বা তাওয়া [অর্থাৎ ডেগচি বা তাওয়া দ্বারা পাকানো হলে ইহা রুটি, পোলাও ইত্যাদি নাম ধারণ করে],
যেমন হাঁটতে পায়ের জন্য প্রয়োজন জুতা।

অর্থাৎ ঐ লোহা হল ফকিরের জন্য শক্ত কভার বিশেষ, যার নিচে কঠোর রিয়াজতের হাতুড়ি, মোজাহেদায়ে নফ্স এবং ইশকের আগুনের লাল শিখা রয়েছে। অর্থাৎ লোহা আগুন ছাড়া গরম হয় এবং আদ্র বস্তু লোহার কড়াই দ্বারা শুকায়। অনুরূপভাবে, ইমামুল হক নুরে খোদাকে আল্লাহ্র ফয়েজ কোন মাধ্যম ছাড়া কবুল করেন এবং অন্যান্য আউলিয়া কেরাম মাধ্যম সহকারে ফয়েজ পেয়ে থাকেন।

ফকির (অলি) ঐ ব্যক্তি যিনি কোন মাধ্যম ছাড়া
অগ্নি শিখাকে নিজের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত করে।
ঐ ফকির বিশ্ব জাহানের জন্য হৃদপিণ্ড স্বরূপ,
কেননা শরীর উক্ত হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে নৈপুন্যে পৌঁছে।
যদি হৃৎপিণ্ড না থাকে তাহলে শরীর কথা-বার্তা কি করে জানবে?
যদি দিল(হৃৎপিণ্ড) অনুসন্ধান না করে, তাহলে শরীর অনুসন্ধান করা কি করে জানবে?

এই জন্য অগ্নি শিখার পছন্দনীয় হল লোহা,
খোদার পছন্দনীয় হল দিল (হৃৎপিণ্ড), শরীর নয়।
অতএব, অপরাপর দিল (এই যুগের অপরাপর আউলিয়া) শরীরের মত,
যাঁরা গাউছুল আজম বা কুতুবল আকতাব তাঁরা দিলওয়ালাদের জন্য খনি স্বরূপ
[অর্থাৎ কুতুবুল আক্তাব অন্যান্য অলিদের ফয়েজ পৌঁছিয়ে থাকেন]।
এই কথাগুলো অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে,
কিন্তু আমি ভয় করছি যে, সাধারণ লোকেদের বুঝার পদস্খলন না ঘটে।
যাতে আমাদের ভাল কাজ মন্দ কাজে পরিণত হয়,
এই সমস্ত আমি যা কিছু বলছি, তা ভাবাবিষ্ট অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

অতঃপর প্রকৃতপক্ষে ফকির তিনি, যিনি নিজেকে ফানা (বিলীন) করে দেন এবং আল্লাহ্‌র মহান সত্তার সাথে বাকা অর্জন করেন। আর তিনিই খোদার খলিফা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নায়েব (প্রতিনিধি) হয়ে থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি আবে হায়াত সদৃশ, তিনি অনন্তকাল ধরে সর্বদা বিদ্যমান থাকবেন। কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হবেন না। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আমি নিশ্চয়ই তাঁকে পবিত্র জীবন দান করব' (সূরা নাহলঃ ৯৭)। অর্থাৎ তাঁকে আমি মৃত্যু যন্ত্রণা মুক্ত পবিত্র জীবন দান করব। ইহাই ঐ হযরতগণের অবস্থার বর্ণনা। পৃথিবী তাঁদের নিসবতের আঙ্গিকে দেহ সদৃশ। আর তাঁরাই হলেন পৃথিবীর প্রাণ ও অন্তর। যদি অন্তর বা প্রাণ না থাকে, তাহলে শরীর কিভাবে কথা বলবে? যদি অন্তর কোন কিছুর খোঁজ খবর রাখতে না পারে, তাহলে শরীর কিভাবে অনুসন্ধান করবে? অতঃপর সূর্য কিরণের দৃষ্টিস্থল যেরূপ লোহা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র তাজাল্লীর দৃষ্টিস্থল হলেন, গাউছে জমানের অন্তর, পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি নয়; যা দেহ সদৃশ। হৃদয়সমূহ ও পৃথিবীবাসী হৃদয়বান গাউছে জমানের নিসবতের দৃষ্টিকোণে দেহের অনুরূপ। তাঁর (গাউছে জমান) দেহ মোবারক প্রাণ সদৃশ। অতঃপর উক্ত বিষয়টি আরো বিস্তারীত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কিন্তু আমি আশংকা করছি যে, ইহাতে সাধারণ লোকদের বুঝার ক্ষেত্রে পদস্খলন না হয়। যাতে আমাদের নেক কাজ খারাপ কাজে পরিবর্তীত হয়ে না যায়। আর ইহা যা বলা হল, যেন তা ভাবপ্রবণ অবস্থায় বলা হল।

চতুর্থ ফরতু : ইলম (জ্ঞান) ও আলেমদের পরিচিতি প্রসঙ্গে

গোপন থাকে না যে, ইলম বহু মূল্যবান বস্তু। জ্ঞান দুনিয়া ও পরকালে আলেমের জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী। শত অফসোসের বিষয় হল যে, আরবের সূর্য ও পারস্যের যুগের সূর্য অস্তমিত হল। উর্দু ভাষায় যা কিছু বাকি আছে তা অন্ধকার হৃদয়ের আলোকবর্তিকা। কিছুদিনের মধ্যে এই কাহিনীও শেষ হয়ে যাবে । হক্কানী ও ফাযেল আলিমগণ যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেলেন, আমরা যারা নাকেচ (অসম্পূর্ণ) আছি, তারা স্বীয় বিবেচনায় কামিল (পূর্ণ), লেখা-পড়া না করে নাম মুহাম্মদ ফাযেল।

মসনবী

আশ্চর্য এক যুগ চলছে-অজ্ঞতাকে নাম দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও দক্ষতা।
জ্ঞান ও দক্ষতা হল নিন্দিত এবং অজ্ঞতা হল প্রচলন,
পাথরের মাথায় পরানো হল সোলেমানী মুকুট।
আজ জান-প্রাণ দিয়ে ক্রয় করা হচ্ছে ইহা,
দোকানেও অজ্ঞতার এই ফর্দের কথা শুনা যায়।
নির্বোধদের পানীয়কে বলা হয় গোলাপজল ও চিনি,
আর জ্ঞানীদের পান করাও যকৃতের রক্ত।
ঘোড়ার জিনে ক্ষত হল, কিন্তু ঘোড়া পড়ে যায়নি,
গাধাকে গলায় স্বর্ণের হার পরানো হল।

স্বল্প পরিমাণ উর্দু ও ফার্সি শিখে, হাদিস ও তাফসীর না পড়ে, দীন (ধর্ম) ও পরকাল বিমুখ। খোদা রাসূল থেকে দূরে থেকে নিজেকে যুগের বায়েজিদ ও জমানার যুনাইদ দাবি করে পশুবৎ সাধারণ লোকের সামনে নিজেকে খোদার খলিফা ও নায়েবে রাসূল দাবি করে। আল্লাহু আকবর! এই রূপ মানব ছুরত ধারণকারী এবং শয়তানী চরিত্র গ্রহণকারী লোক, নায়েবে রাসূল ও নবীদের ওয়ারিস ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দাবি করা পাপের শিকল নিজেদের গর্দানে বাঁধার মত। বরং তা আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর অপবাদ দেওয়ার নামান্তর। ইহা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের উপর এমন একটি যুগ আসবে, ঐ যুগের ওলামাদের অন্তর নেকড়ে বাঘের অন্তরের মত হবে এবং তাদের কথা নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথার মত মনে হবে এবং তাদের কাজ কারবার ফেরআউনের কাজ কারবারের মত হবে। আমরা তাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণকারী। তাদের বাতেনী চোখের দৃষ্টিহীনতা ও বক্রদৃষ্টি দ্বারা সমগ্র

বিশ্বকে গোমরাহীর কূপে নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করে। স্বয়ং অজ্ঞতার আবরণে আবরিত থেকে অপরের হেদায়তের পথ প্রদর্শক হয় আর সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীকে রহমতের ফয়েজ বর্ষণ থেকে বঞ্চিত রাখে।

খোদা রাসূলের ভয়হীন, কুরআন হাদিসের ব্যাপারে বেখবর ছোট মুখে যেমন তেমন বড় বড় কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়। কতই দাম্ভিক! ঐ ওলামাদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এই যে, কিছু দিনের দুনিয়াদারীর জন্য নিজের দীন (ধর্ম) কে পুরাপুরি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে না। হালাল ও হারামের মাঝে বাচ-বিচার রাখে না। সামান্য তুচ্ছ বস্তু যদিও দুনিয়ার গোবর পরিমান হয়, তা পাওয়ার জন্য যার তার সামনে গিয়ে কাকুতি মিনতি সহকারে চৌধুরী সাহেব ও মুন্সি সাহেব বলে নির্লজ্জ কুকুরের মত হাতজোড় করে। দুনিয়া হল মৃত জীব সাদৃশ্য এবং দুনিয়াদার হল কুকুর তুল্য। লোভ-লালসা অধিক হওয়ার কারণে ঐ দুনিয়ার কুকুরদের কাছে কোন উচ্চ বাচ্য করে না। অর্থাৎ দুনিয়ার গোবর তুল্য বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে সত্য কথা বলেনা। যদিও উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে কিছু ভাল কথা অপরকে বলেও থাকে। কিন্তু নিজেরা সেটার উপর আমল করে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছ, আর নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসছো'? (সূরা বাকারা -৪৪)।

পংক্তি

তারা ওয়াজ করে কিন্তু নিজেরা আমল করে না,
যেন কানা চোখা দাগী শয়তান।

লোকদেরকে নিজেদের প্রতারণা ও শঠতার ফাঁদে ফেলার জন্য নিজেদেরকে মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সুফি সাহেব হিসেবে প্রকাশ করে। এমন আলেম খোদা-রাসূলের দুশমন, ইসলামী বুনিয়াদকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে তৎপর এবং ধর্ম ও ঈমানকে ধ্বংসকারী। প্রকৃতপক্ষে শয়তান মানব আকৃতিতে থাকে। তারা নায়েবে রাসূল তো নয় বরং অভিশপ্ত শয়তানের প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে তারা নমরুদের খলিফা ও ফেরআউনের প্রতিনিধি।

বর্ণিত আছে যে, একবার কোন বুজুর্গ অভিশপ্ত শয়তানকে বেকার বসা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অভিশপ্ত! তুমি তো খোদার বান্দাহদেরকে তোমার প্রতারণা ও শঠতার ফাঁদে ফাঁসিয়ে থাক, এখন বেকার ও কর্মহীন অবস্থায় বসে আছ কেন? অভিশপ্ত শয়তান উত্তর দিল, হুজুর এই দূর্বল পীরের আরো অনেক খলিফা রয়েছে, যখন থেকে তারা পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করে, তখন থেকে আমি আমার কাজ কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করি। ঐ বুজুর্গ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করল, সে (শয়তান) বলল, ঐ খলিফাগণ হল আপনার

সম্প্রদায়ের লোক। তারা হল দুনিয়াদার আলেম এবং শেষ জমানার ফাযেলগণ। তারা মলিন দুনিয়ার লোভ-লালসায় পড়ে স্বীয় পরকালকে বিসর্জন দেয় এবং খোদা ও রাসূলকে একেবারে ভয় করে না। আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। এই সমস্ত আলেমদের তাছিরহীন (প্রভাবহীন) ওয়াজ শুনা এবং নিষ্ফলা উপদেশ কানে শুনা; যা পক্ষপাতিত্ব ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত নয়, তা পুরোপুরি জায়েজ নয়। আর উহার আমল করা পথভ্রষ্ঠতার এবং খোদা ও রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণ। হে আল্লাহ! মুসলমান ভাইদেরকে এই রূপ বালা-মুসিবত (বিপদ) থেকে রক্ষা করুন (আমিন)।

মসনবী

পানি ও রুটির জন্য কেন উদ্ভ্রান্ত?
স্বীয় সম্ভ্রমকে তুমি দিয়েছ নষ্ট করে।
তুমি ধনীদের সাহচর্য ত্যাগ কর,
তাদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন কর,তাহলে তোমার কোন ত্রুটি হবে না।
হে যুবক! তোমাকে যদি কারুনের সম্পদ দেয়া হয়,
তবুও দুনিয়াদারদের দ্বারে কখনো যাবে না।
ক্ষুধার তাড়নায় যদি তোমার প্রাণ পাখি খাঁচা থেকে বের হয়ে যায়,
মাছির মত স্বীয় হাতজোড় (যাচনা) তাদের (ধনী) করিও না।
তুমি জোলাপ (মল নিঃসারক ঔষধ) খেয়েছ, তোমার অসুখ সেরে যাবে,
দুনিয়ার তাগিদে তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করিও না।
সর্বদা অল্পে তুষ্টির নীরব জায়গায় বসে যাও,
যাতে খোদার হুকুম তোমার থেকে যেন লংঘন না হয়।
কায়কাউস বাদশাহর (ইরানের নামকরা বাদশাহ) সিংহাসনকে গিয়ে লাথি মার,
স্বীয় লজ্জা শরমকে বিক্রি করে দিও না।
যদি তোমাকে ধন সম্পদ ও নগদ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়,
সুউচ্চ প্রেরণাকে ছেড়ে দিও না, যদিও তাতে লাভ থাকে।
পার্থিব সম্পদের ভালবাসা ত্যাগ কর,
স্বর্ণের [টাকা পয়সা] জন্য মানুষের রক্ত চুষিও না।
স্বর্ণের [টাকা পয়সা] জন্য ইজ্জত-সম্মান যা লাভ করেছিল তা বরবাদ করে দিল,
ঐ সমস্ত কুকুরগুলোকে গাভী ও গাধা মনে কর।
তপস্যা ও খোদা ভীরুতা এটা নয় যে পুরাতন খিরকা পরিধান করে
লোকের সামনে নিজেকে সূফী হিসেবে উপস্থাপন করা।
চিরুনী, মেসওয়াক, তাসবীহ, জুব্বা ও দস্তার (রুমাল) পরিধান লোক দেখানো বটে, এতে অন্তরের পরিশুদ্ধতা নেই।

কতেক অনর্থক লোককে যখন দেখে একত্রিত,
তখন সে লালসাহীন শায়খ হিসেবে নিজেকে প্রদর্শন করে।
দস্যুর মত ফাঁদ পেতে নিজেকে কামনা-বাসনাহীন শায়খে যামান বলে
উপস্থাপন করে।
হে অযোগ্য, ইহা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা,
প্রতি মুহূর্তে শয়তান তোমার সাথে গর্তের বন্ধু হিসেবে আছে।
হে ধোঁকাবাজ, তুমি নিজে ন্যায় বিচার কর,
তোমার অন্তর ধোঁকাবাজিতে পূর্ণ যদিও তোমার বগলে কুরআন রয়েছে।
শয়তান প্রতি মুহূর্তে তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু,
সত্য পথে তুমি কিভাবে সুদৃঢ় থাকবে?
দাঁড়ি, রুমাল ও চোয়াল তোমার রক্ষাকর্তা,
দুনিয়ার ভালবাসা হল তোমার সম্পর্ক স্থাপনের জুন্নার (বেল্ট) স্বরূপ।
তুমি খোদার আনুগত্য কর লোক দেখানোর জন্য,
কখনো কি খোদার জন্য সিজদা করেছ?
যাতে লোকেরা তোমাকে মনে করে আল্লাহ ওয়ালা, মুত্তাকী, খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ।
ধন-সম্পদে তোমার হাত লম্বা হয়ে গেছে,
তুমি খোদার ইবাদতের বিনিময়ে মজুরি গ্রহন করে থাক।
তোমার একটি অন্তরে শত কামনা-বাসনায় ভরপুর,
আর ইহা [কামনা বাসনাপূর্ণ অন্তর] দ্বারা ফাঁড়া দিলকে ঝাঁড় ফুঁক করে থাক।
বিদ্বেষ, প্রতারণা ও আমিত্ব দ্বারা তুমি সুশোভিত,
আর ভণ্ডামী ও প্রতারণা দ্বারা তুমি সজ্জিত।
প্রত্যেক দিকে তুমি অহমিকার সাথে তাকাও,
নিজে নিজেকে বল যে, আমরা সব খবর রাখি।
মূর্তি বানিয়ে তুমি মূর্তিপূজা কর,
তোমার অন্তর ঈর্ষায় পূর্ণ।
তুমি কেন আসল (মূল) ও বংশের দোহাই দিয়ে ফুলে যাচ্ছ?
হে বেয়াদব! অহংকার থেকে দূরে থাক।
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, তুমি খোদার ব্যাপারে অনবগত,
খোদাকে ভয় না করে তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছ।

'তাজকিয়াতুল কুলুব' গ্রন্থে আছে, একথা প্রতীয়মান যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি থেকে উত্তম ও সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় খলিফা এই মানব জাতি থেকে নির্বাচন করেন। এতদ্প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'আমি আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা দান করেছি'। উক্ত আয়াতের

ঘোষণার মাধ্যমে মানব জাতিকে তিনি সম্মানিত করেছেন। আর এই মর্যাদা দান ও সম্মানিত করার ব্যাপারে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব যাঁর অস্তিত্বের কারণে, তিনি হলেন হযরত খায়রুল বশর, আদি ও অন্তের অহংকার, শেষ নবী রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল এই মানব জাতি থেকে জন্ম লাভ করেন। তাঁর সত্তার সীমাহীন ফয়জের বরকতে মানুষ দুনিয়া ও পরকালে সম্মানিত ও মর্যাদার আসনে অধিষ্টিত হয়। হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর উপাধি ছিল আবুল বশর এবং আমাদের হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); যিনি শেষ নবী ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উপাধি আবুল আরওয়াহ (রূহদের পিতা)। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, এই কারণে সমস্ত সৃষ্টি থেকে মানুষের মরতবা দ্বিগুণ হয়ে গেল। যেমন হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) কে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। সেই কারণে আরশ ও জমীনের ফেরেশতাগণ নিজ নিজ অপরাধের কারণে লজ্জিত হয়ে তাঁকে (আদম) সিজদা করল। হযরত খিজির (আলাইহিস্সালাম) কে ইলমে লাদুন্নী প্রদান করা হল এবং হযরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) তাঁর (খিযির) ছাত্র হলেন। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম) কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলেন, তিনি সাম্রাজ্যের মালিক হলেন এবং জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেন। হযরত দাউদ (আলাইহিস্সালাম) কে শিল্প জ্ঞান দান করা হল এবং তিনি সম্পদশালী হলেন। হযরত সোলায়মান (আলাইহিস্সালাম) কে পাখিদের ভাষার জ্ঞান দান করা হল। জিন, মানব, চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি তাঁর তাবেদার হল। হযরত ইসা (আলাইহিস্সালাম) কে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের জ্ঞান দান করা হল এবং তিনি মুরসাল নবী হিসেবে গণ্য হলেন। তিনি দোলনায় থেকে স্বীয় মায়ের পবিত্রতার স্বাক্ষ্য দিলেন। আমাদের পয়গাম্বর ছাহেব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দ্বীন ও দুনিয়ার ইলমে লদুন্নী প্রদান করা হয়। তিনি সমস্ত মুরসাল নবী ও সমগ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে ইলম (জ্ঞান) ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং অন্য প্রাণীদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা দান করলেন, যা মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে তাদের জুটলনা। তারা (যাহেল আলেম) সাধারণ পশুদের মত বরং তার চেয়ে অধম। প্রকাশ থাকে যে, ইলম (জ্ঞান) সত্তাগতভাবে সম্মানিত এবং ইহা জ্ঞানীকে সম্মনিত করে। যেমন প্রবাহিত পানি নিজে পাক এবং অপরকে পবিত্র করতে পারে। ইলম রূহানী খাদ্য। আর ইমানী স্বাদ নি:সন্দেহে মুর্খদের চেয়ে আলেমদের সর্বদা হাসেল থাকে।

জ্ঞানের আহল নয় এমন ব্যক্তিদের বদঅভ্যাস বা খারাপ প্রকৃতির কারণে ইলমের মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং এতে ইলম বিলুপ্ত হয়। তাই ইহা ইলমের দোষ নয় এবং এতে ইলমকে খারাপ বলা যাবে না। ইহা ইলমের আহল নয় এমন ব্যক্তিদের দোষ। যেমন শুকরের গলায় স্বর্ণের হার পরানো। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- "আহল নয় এমন ব্যক্তিদের জ্ঞান বিতরণ শুকরের গলায় মূল্যবান বস্তু, মুক্তা ও স্বর্ণের হার পরানোর অনুরূপ।" আল্লাহওয়ালা আলেম এবং হক্বপন্থী ফাযেলগণ নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম) ওয়ারিস। ইলম ও হিকমত (বিজ্ঞান) নবীদের রেখে যাওয়া অংশ, ধন ও সম্পদ পয়গাম্বরদের (আলাইহিমুস্সালাম) অংশ নয়। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-" নিশ্চয় আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। তাঁরা কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা রেখে গেছেন ইলম। অতঃপর যেই ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে বড় অংশ পেল। আর যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন একটি পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।" অর্থাৎ আলেমগণ নিঃসন্দেহে নবীদের ওয়ারিস, দীনার ও দিরহাম তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ নয়। বরং তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ হলো জ্ঞান। অতঃপর যেই ব্যক্তি ইলম পেল, সে বড় অংশ পেল এবং সৌভাগ্যবান হল। আর যে ব্যক্তি যে কোনভাবে ইলম অর্জন করে, আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশতের দিকের রাস্তা সহজ করে দেন।

জানা উচিত, ইলম দুই প্রকার। যথা: (১) ইলমে দারাসত (২) ইলমে ওয়ারাসাত। শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞানকে ইলমে দারাসত বলা হয়। আর শরীয়তের বাতেন (অভ্যন্তরীন) জ্ঞানকে ইলমে ওয়ারাসাত, ইলমে হাকিকত ও ইলমে লাদুন্নী বলা হয়। ধার্মিকতা এবং শরীয়ত মোতাবেক চলার জন্য যতটুকু পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ জ্ঞানার্জন ফরজ। আর যেই ইলম ধার্মিকতার পরিপন্থী উহা অর্জন করা হারাম। এবং ইলমে তাওহীদ (একত্ববাদ বিষয়ক জ্ঞান), ইলমে সির (খোদার গুপ্ত রহস্য বিষয়ক জ্ঞান), উলুমে শরয়ী (শরীয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান), উলুমে ক্বলব (অন্তঃকরণ বিষয়ক জ্ঞান), মা'রিফাতিল খাওয়াতির (অন্তরের পরিচিতি), ইলমে মুকাশিফ (কশফ বা দর্শন জ্ঞান) শিক্ষা করা বাতেনী আলেমগণ ফরজ বলে থাকেন। 'তাফসীরে কবির' এ উল্লেখ আছে যে, "আওয়ারেফুল মা'আরিফ" গ্রন্থকার হযরত শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, হযরত সা'দী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) আলেমকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম প্রকার হল- আলেম বিল্লাহ গায়রে আলেম বি আমরিল্লাহ

অর্থাৎ এই প্রকার আলেম খোদার মা'রিফাতের খবর রাখেন, খোদার প্রেম সমুদ্রে ডুবে গেছেন। উভয় জাহান থেকে আলাদা হয়ে গেছেন, শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে খবর রাখেন না। দ্বিতীয়টি হল- "আলেম বি আমরিল্লাহ গায়রে আলেম বিল্লাহ"। এই প্রকারের আলেম বাহ্যিক শরীয়ত মোতাবেক আমল করেন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে অবগত, কিন্তু খোদার ব্যাপারে কোন খবর রাখেন না । তৃতীয় প্রকার হল- আলেম বিল্লাহ ওয়া বি আমরিল্লাহ। এই প্রকারের আলেম উভয়টির ব্যাপারে অবগত। এই প্রকারের আলেম পূর্বোক্ত দুই প্রকারের আলেম থেকে প্রত্যেক দিক থেকে উত্তম।

এই সমস্ত আলেমদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের আলেমদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা মুখে যিকির করে, কিন্তু অন্তরে যিকির করে না, তারা মানুষদের ভয়ে যিকির করে, খোদার ভয়ে করে না। সৃষ্টি জীবের কাছে লজ্জিত হয়, কিন্তু স্রষ্টার কাছে লজ্জিত হয় না। যেই সমস্ত আলেম আরেফ বিল্লাহ হন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ইহার বিপরীত। তৃতীয় প্রকারের আলেম পূর্বোক্ত দুই প্রকারের সাথে অংশিদার। তৃতীয় প্রকারের আলেম পূর্বোক্ত দুই প্রকার আলেমের শিক্ষক এবং তিনি তাঁদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী বিষয়ে মুখাপেক্ষী; যার ভিত্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্রধর্ম, ফিকহ, আকাইদ ও তাসাউফ। যেইভাবে ফিকহ আকাইদের জ্ঞান শিক্ষা করা এবং তার উপর অমল করা সব মুসলমানের উপর ফরজে আইন। অনুরূপভাবে ইলমে তাসাউফ শিখা এবং উহা অর্জন করা ফরজে আইন।

তাই হাদিসে জিব্রাইল (আলাইহিস্সালাম) এ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, যেখানে উক্ত তিনটি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই তিন প্রকারের ইলম একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। এইগুলোর মধ্যে কোনটি অপরটি ছাড়া পূর্ণ হয় না। কেননা তাসাউফ ফিকহ ছাড়া শিক্ষা করা জায়েজ নয়। কেননা খোদার বিধান ফিকহ্ ছাড়া জানা যায় না। আর ফিকহ্ তাসাউফ ছাড়া পূর্ণ হয় না। সেইজন্য হুজুরী ক্বলব ও আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ ব্যতীত আমল পূর্ণ হয় না। এই দুইটি (ইলম ও আমল) কখনো ইমান ছাড়া শুদ্ধ হয় না, যেরূপ রূহ (আত্মা) ও শরীর। কেননা রূহ ও শরীর একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সেই কারণে হযরত ইমাম মালেক (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- "যে ব্যক্তি তাসাউফ শিখল কিন্তু ফিকহ্ জানল না, সেই যিন্দীক (ধর্মহীন)। আর যে ব্যক্তি ফিকহ্ শিখল, কিন্তু তাসাউফ শিখল না, সেই ফাসেক (পাপাচারী)। যেই ব্যক্তি উভয়টি শিখল, তিনি মুহাক্কিক (খোদা অনুসন্ধানী)। কতক আলেম

বাহ্যিক অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানতার কারণে তাসাউফকে অস্বীকার করে। মূলত নিম্নোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-"আমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করি এবং কিছু অংশ অস্বীকার করি"।

মসনবী

আমি তোমার কাছে যা বর্ণনা করছি তা মনোযোগ সহকারে শুন,
যার দ্বারা তোমার কাছে গোপন রহস্য স্বত:প্রকাশিত ও স্পষ্ট হয়।
হে ভাই! ইলম দুই প্রকার। যথা: প্রথমটি হল ইলমে বাতেন (অপ্রকাশ্য জ্ঞান)
এবং দ্বিতীয়টি হল ইলমে যাহের (প্রকাশ্য জ্ঞান)।
হে বন্ধু! জেনে রাখ, ইলমে বাতেনের ভিত্তি,
তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ইহা দ্বারা সুদৃঢ় থাকতে পারবে।
ইলমে জাহের থেকে হাত গুটিয়ে নিও না,
কেননা উহাও তোমার উক্ত পথচলায় বন্ধু।
এই দুই প্রকার ইলম (জ্ঞান) পরস্পর যুক্ত,
উভয়টি পরস্পর দেহ ও প্রাণ স্বরূপ।
আহমদী দ্বীন উভয়টির সমন্বয়ে গঠিত,
উভয় প্রকার জ্ঞানের উপকারিতা অপরিসীম।
এই দুই প্রকারের জ্ঞান যদি তোমার অর্জন না থাকে,
তাহলে উভয় জাহানে নিশ্চিতভাবে তুমি ক্ষতির সম্মুখীন।
যার যাহের (প্রকাশ্য) জ্ঞান অর্জিত আছে, বাতেনী জ্ঞান নাই,
তার কিভাবে হক্কুল ইয়াকিন হাসিল হবে?
যার বাতেনী জ্ঞান হাসিল আছে কিন্তু যাহের জ্ঞান হাসিল নাই,
তাহলে তার দ্বীন শোভাদায়ক নয়।
মূলত: বাতেনী জ্ঞান যাহেরী জ্ঞানের মগজ (মস্তিষ্ক) স্বরূপ,
যেমন প্রকাশ্য জ্ঞান বাতেনী জ্ঞানের খোসা স্বরূপ, হে বন্ধু! তা জেনে রাখ।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা তোমার অন্তর পবিত্র হবে
এবং যাহেরী জ্ঞান দ্বারা তোমার অন্তরে চিড় ধরবে।
বাতেনী জ্ঞান খোদার নুর স্বরূপ,
যাহেরী জ্ঞান আমিত্বের কারণ।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা ঈমানের স্বাদ বৃদ্ধি পায়,
যাহেরী জ্ঞান দ্বারা মানুষের অহমিকা বাড়ে।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা অজ্‌দ (প্রেম বিভোরতা) ও হাল (অবস্থা) আসে,
যাহেরী জ্ঞান দ্বারা তর্ক বিতর্ক ও মতবিরোধ দেখা দেয়।
বাতেনী জ্ঞান খোদার নূর পাওয়ার জন্য যথেষ্ট,

যাহেরী জ্ঞান অহমিকা ও আমিত্বের কারণ।
বাতেনী জ্ঞান তোমার রূহের খাদ্য,
যাহেরী জ্ঞান তোমার নফ্সের খাদ্য।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা রূহের বাক্বা লাভ হয়,
যাহেরী জ্ঞান দ্বারা নফ্সের বাক্বা লাভ হয়।
বাতেনী জ্ঞান খোদার দিকে পৌঁছিয়ে দেয়,
ইহা অন্য সবকিছু ত্যাগ করে খোদার সাথে মিলিয়ে দেয়।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা তুমি নভোমণ্ডলে উড়তে পার,
যাহেরী জ্ঞান দ্বারা তুমি মাটিতে আঁচড়ে পড়তে পার।
বাতেনী জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল (গৃহিত) হয়,
যাহেরী জ্ঞান দ্বারা তুমি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পার।

পঞ্চম ফরতুঃ মানব কোন স্তরে পৌঁছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর খলিফা ও নবীদের (আলাইহিমুস্ সালাম) ওয়ারিস হয়ে থাকেন- এই বিষয়ের বর্ণনা

এখন মুসলমান ভাইয়েরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, আল্লাহওয়ালা আলেম কোন ব্যক্তি, সত্যপন্থী ফাযেল ব্যক্তি কারা, নবীদের ওয়ারিস ও খোদার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রতিনিধি কারা? হযরত কতুবুল আক্তাব, ফরদুল আহবাব গাউছুল্লাহিল আজম শায়খে শুয়ুখুল আলম, পীরে পীরান, মীরে মীরান শাহে জিলান মহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় মহান গ্রন্থ "ফতহুল গায়ব" এর চতুর্থ মকালা (অধ্যায়) এ উল্লেখ করেন। আর এই অধম উহা হুবহু নকল করে কিঞ্চিত বিশ্লেষণ করে অনুবাদ করে দিচ্ছি। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- "হে খোদার রাস্তার পথচারী, যখন তুমি মানুষদের থেকে মৃত্যুবরণ করেছ অর্থাৎ তাদের (মানুষ) দান করা, দান না করা, প্রশংসা করা, নিন্দা করা, সৎকাজ, খারাপ কাজ এবং সমস্ত অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে গেলে এবং ফানা (বিনাশ) হয়ে গেলে। আর এইগুলোর অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা তোমার নিকট বরাবর গণ্য হল। সেই সময় তোমাকে বলা হবে, তোমাকে আল্লাহ্র সুমহান দরবারে দোয়া করা হবে। তোমার ব্যপারে খোদার সুউচ্চ দরবারে জানিয়ে দেয়া হবে। তোমাকে স্বপ্ন বা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড বা ইলহাম বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দেয়া হবে। তুমি তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার বরকতে সুউচ্চ মকামে ও স্তরে উন্নতি লাভ করবে। আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। আর খোদা তায়ালা তোমাকে নফ্সের কুপ্রবৃত্তি এবং কামনা বাসনার আকাঙ্খা এবং সমস্ত দুনিয়াবী আনন্দ বা স্বাদ থেকে মুক্তি দিবে। এমনকি নফসের কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ তোমার অনুগত হয়ে যাবে। মূলতঃ নফ্স তার পরিপন্থী চলতে পারবে না। আর যখন তুমি নফ্সের কুপ্রবৃত্তি থেকে মরে গেছ। তখন বলা হবে, তোমাকে আল্লাহ রহমত করুক। মৃত্যু দান করবে স্বীয় ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও আকাঙ্খা থেকে। এমনকি তোমার কোন কামনা-বাসনা বাকি থাকবে না। অর্থাৎ ইচ্ছা ও আকাংখা যেটি স্বীয় তদবির ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি গ্রহণ করতে, উহা বাকি থাকবে না। যদিও এই তদবির সমূহ (প্রচেষ্টা) ও স্বীয় ইচ্ছায় পছন্দ করার বিষয়টি; অযীফা, ইবাদত ও আনুগত্যের মালিক পূতঃপবিত্র সত্তা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দার জন্য নির্ধারণ করে দেননি, কিন্তু তা ইবাদতের পথে

অন্তরায়ও নয়। তা সত্ত্বেও যেই বাসনা ও ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালার বাসনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী হবে তাই হবে। সেটি বান্দার ইচ্ছা ও বাসনা নয়, বরং ইহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও বাসনায় পরিণত হবে।

পংক্তি

যে তোমাকে বলে, করিও না, অতঃপর উহা করিও না,
যে তোমাকে বলে, বলিওনা, অতঃপর উহা বলিও না।

আর কতেক স্বল্প সমজদার ব্যক্তি যারা সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর বাণী- "আমি ইচ্ছা করি যে, আমি আর ইচ্ছা করব না।" এই কথার উপর প্রশ্ন তুলেছে যে, ইচ্ছা না করাও ইচ্ছার অন্তর্ভূক্ত। এই ধরনের প্রশ্ন অসম্ভব ও অবান্তর। কেননা তারা সুলতানুল আরেফিন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর কথার রহস্য না বুঝে প্রশ্ন উথাপন করেছে। যখন তুমি স্বীয় ইচ্ছা ও বাসনা থেকে মরে যাবে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তখন তোমাকে বলা হবে, তোমাকে আল্লাহ রহমত করুন এবং তোমাকে তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে জীবিত ও বাকি রাখুক। কেননা প্রতিটি ফানার জন্য বাক্বা আবশ্যক। অতঃপর সেই অবস্থায় তোমার এমন জীবন লাভ হবে, তারপর আর কখনো তোমার মৃত্যু হবে না।

পংক্তি

আল্লাহ্‌র প্রেমে যে জীবন লাভ করল তার মৃত্যু হয় কে বলবে,
সে খোদার সত্তার সাথে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করল।

আর এমন সম্পদ তোমার লাভ হবে, তারপর আর কখনো দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হবে না। প্রকৃতপক্ষে ফখর (মুখাপেক্ষীতা) আল্লাহ্‌র দিকে বান্দার মুখাপেক্ষীতাকে এবং অমুখাপেক্ষীতা বলতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে অমুখাপেক্ষীতাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে অমুখাপেক্ষীতা হল- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার অমুখাপেক্ষীতা লাভ করা। অতএব, ফখর (মুখাপেক্ষীতা) এক্ষেত্রে হল অমুখাপেক্ষিতা এবং এই অমুখাপেক্ষীতাই হল ফকিরী। এই স্তরে তোমাকে (বান্দা) এমন প্রতিদান দেওয়া হবে যা কেউ রুখতে পারবে না। এমন খুশি তোমার নসীব হবে, যারপর তোমার কোন পেরেশানী থাকবে না। আর এমন নিয়ামত সমূহ তোমাকে দেওয়া হবে, যারপর আর কোন দূর্দশা থাকবে না এবং এমন জ্ঞান তোমার অর্জন হবে, যারপর আর কোন অজ্ঞতা থাকবে না। আর তোমাকে এমন নির্ভীক করা হবে, যারপর আর কোন ভয় থাকবে না। আর এমন সৌভাগ্যবান তোমাকে করা হবে, যারপর আর দূর্ভাগা হবে না।

তোমাকে এমন নৈকট্য দেয়া হবে, যারপর আর কোন বিচ্ছেদ, দূরত্ব ও বিরহ থাকবে না। আর তোমাকে এমন উচ্চ স্তর ও সুউচ্চ পদবী প্রদান করা হবে, যারপর তোমাকে আর পদচ্যুতি ও অবনমন করা হবে না। তোমাকে এমন সম্মানিত করা হবে. যারপর আর হীন করা হবে না। নফ্সের সমস্ত অপবিত্রতা ও মানবীয় দোষ থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা হবে, যারপর আর ময়লাযুক্ত ও অপবিত্র করা হবে না। মূলকথা ও সারমর্ম এই যে, যখন মানবীয় অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিপালকের সিফাতী নূর তাঁর মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন প্রতিপালকের সিফাত বাকী ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তা কখনো বিনাশ প্রাপ্ত ও দূরীভূত হয় না। সেজন্য আ'রেফদের ঐকমত্য এই কথার উপর যে, বিনাশ প্রাপ্ত বস্তু তার সিফাত বা গুণাবলীর দিকে ফিরতে ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ মানবীয় সত্তা থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি, পুনরায় স্বীয় মানবীয় সত্তায় প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। কোন পদ্ধতি ব্যতীত লয় প্রাপ্ত বস্তুকে পুণরায় পূর্ববর্তীরূপে ফিরানো যায় না। অর্থাৎ যদি কেউ কোন বস্তুকে ফিরিয়ে আনে তাহলে ফানা (বিনাশ) পদ্ধতির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনে। কেননা কোন বস্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

কবিতাংশ

ইশকের পেয়ালার শরাব পানে আমি মাতাল হয়েছি, কিভাবে আমি পা ফেলব?
বাদশাহী পোশাক পরিধান করেছি, অতঃপর কিভাবে ফকিরী করব?
যে স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে খোদার কাছে মকবুল (গৃহিত) হয়ে গেল,
প্রাণের প্রেমাস্পদ থেকে এখন কিভাবে বিচ্ছিন্ন হব?

অতঃপর সালেক (খোদা পথচারী) এর সমস্ত পথচলা হল সায়ের ইলাল্লাহ (আল্লাহ্র দিকে বান্দার গতি) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। যেটি মানবীয় সত্তাকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। আর যেই সালেক (খোদা পথচারী) এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তিনি পূর্ণাঙ্গ অলংকার দ্বারা সুশোভিত হয়ে যান। ইহা তার জন্য সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। আর সায়ের ফিল্লাহ (আল্লাহ্র মধ্যে বান্দার গতি) এর স্তর এখান থেকে শুরু হয়। আর এই স্তরে সালেক আল্লাহ্র সিফাতী তজল্লী দ্বারা শিক্ষা লাভ করতঃ পূর্ণতা স্তরে উপনীত হন। ইহার পরবর্তী স্তর হল সায়ের মিনাল্লাহ (আল্লাহ হতে বান্দার গতি)। সালেক অপূর্ণদের পূর্ণতার জন্য এই স্তর থেকে নীচে অবতরণ করেন।

পংক্তি

যদি সূর্যের আলো প্রস্ফুটিত না হয়,
তাহলে অন্ধকারে পথ কিভাবে দেখা যাবে?

অতঃপর উহার পরবর্তী স্তর হল সায়ের ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র দিকে বান্দার গতি) স্তর। ইহা সৃষ্টজীব হতে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্তর। নিম্নোক্ত বাণীটি ইহার দিকে ইঙ্গিতবহ - "আমি সুমহান বন্ধুকে বেছে নিয়েছি।" এই সায়ের এর পরবর্তী স্তরে ইরশাদ (পথ প্রদর্শন) ও পূর্ণতা অর্জন এর ধারাবাহিকতা প্রকাশ্যভাবে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার বিষয়টি সালেকের আধ্যাত্মিক জীবন বাকি থাকার কারণে জারি থাকে। তখন লোকেরা মৃতকে জীবিত মনে করে এবং সালেকেরে কাছে কোন কিছুর ফরিয়াদ করলে তা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ হে সালেক (খোদা পথচারী): যখন তুমি পরিপূর্ণভাবে স্বীয় মানবীয় সত্তা থেকে ফানা ও বাক্বা লাভ করেছ, এখন তোমার কাছে সৃষ্টজীব যে ফরিয়াদ ও আর্জি করবে তা পূর্ণ হবে। অর্থাৎ লোকেরা যা কিছু আর্জি ও আশা করবে এবং তোমার কাছে আর্জি জানাবে, আল্লাহ তা পূর্ণ করবেন।

উপকারিতা

উক্ত পবিত্র আল্লাহ্‌র বাণীতে পুরাপুরি উল্লেখ আছে যে, দুনিয়াবী ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েজ। তোমার (সালেক) ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি লোকেরা করবে, সব সত্য ও সঠিক হিসেবে গণ্য হবে ও সত্যয়নকৃত হবে এবং তুমি উহাকে উপযুক্ত মনে করবে। অতঃপর সেই সময় তুমি লাল গন্ধক অর্থাৎ পরশপাথরে পরিণত হবে। জীব সত্তার তাম্রবর্ণ তোমার উদারতা ও শুভ দৃষ্টিতে কিমিয়া (পরশপাথর) এ পরিণত হবে। অর্থাৎ কামাল (পূর্ণতা) স্তর থেকে তাকমিল (পূর্ণতা দান করা) স্তরে উপনীত হবে। দুরবর্তীকে নিকটবর্তী করে দিবে এবং বিচ্ছেদকে মিলনে পরিণত করে দিবে। অজ্ঞকে জ্ঞানী, অন্ধকে চক্ষুবিশিষ্ট, অপরিচিত কে পরিচিত এবং দূর্ভাগাকে সৌভাগ্যবান করে দিবে। হযরত সুলতান জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র বাণীতে আছে যে, "শায়খ দূর্ভাগাকে সৌভাগ্যবান করে দেন ।" অর্থাৎ কামিল মুকাম্মিল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পূর্ণতা দানকারী) ঐ ব্যক্তি, যিনি দুর্ভাগাকে সৌভাগ্যবান করে দেন।

পংক্তি

যে ব্যক্তি মাটিকে স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা কিমিয়া (পরশমণি) করে দেন,
একবার আমাদের প্রতিও যদি শুভ দৃষ্টি দান করেন।

অতএব, তুমি তা খুব কমই দেখতে পাবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে। কেননা অত্যধিক উচ্চ স্তর ও সুউচ্চ শানের অধিকারী হওয়ার কারণে তোমাকে চেনা অসম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত রাজ রহস্য আউলিয়া কেরামের

(রহমতুল্লাহে আলাইহিম) আল্লাহ তায়ালা সাথে রয়েছে, তার ব্যাপারে কোন মানুষের অবগতি থাকে না। তবে কতেক প্রকাশ্য সিফাত যেমন ঈমানের উপর অটল থাকার নূর এবং কিছু কারামতের প্রভাব ব্যতিত সৃষ্টি জীবের ভাগ্যে আর কিছু জুটে না। হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে- "আউলিয়াগন আমার সম্মানের চাদরের নীচে অবস্থান করেন, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাদের চিনেন না"। কিন্তু যদি খোদা পাক কাউকে অবগত করান এবং জানিয়ে দেন, তাহলে চেনা যাবে। আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) মা'রিফাত (খোদার পরিচয়মূলক জ্ঞান), প্রকৃতপক্ষে খোদার মা'রিফাত (খোদার পরিচিতি)।

তিনি মহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা; তিনি যেমন আকল (বুদ্ধি) এবং দৃষ্টি থেকে মহাবিশ্বকে পর্দা করেছেন। তেমনি তিনি তাঁর আউলিয়াদের বাহ্যিক অসুন্দর কারু কাজের পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, যাতে তাঁদেরকে অপরের রোষ থেকে রক্ষা করা যায়। ঐশ্বরিক প্রমাণ ছাড়া তাঁদের চেনার কোন দলীল নেই; যা দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রভূত্ব জানা যায়। তাঁদের দিকে কেউ পৌঁছতে পারে না কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকে যে পৌঁছার ইচ্ছা করে। তুমি (সালেক) সৃষ্টি জীবের মধ্যে এমন সম্মানিত ও প্রিয় হয়ে যাবে, তোমার অনুরূপ কাউকে বিবেচনা করা হবে না। তুমি যমানার অন্যতম ব্যক্তিতে পরিণত হবে, তোমার হাল ও মকামের কোন অংশিদার পাওয়া যাবে না। তুমি অদ্বিতীয় হয়ে যাবে, তোমার সমকক্ষ কাউকে বলা হবে না। আমাদের হযরত সুলতানদের সুলতান আউলিয়া ইজাম ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস্‌সালাম) এঁর খলিফা কুতুবুল আক্‌তাব ফরদুল আহবাব নুরুল আলম গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অধিকাংশ সময় আমরা মহান দরবারের কুকুরদের বলে থাকেন, তোমরা আমাকে কোন দৃষ্টিতে দেখ? যেন তাঁর এই পবিত্র বাণী দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় যে, আমি তোমাদের আকল (বুদ্ধি) এর বৃত্তের বাইরে, আমাকে কারো উপর অনুমান করো না এবং কাউকে আমার উপর অনুমান করো না। প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি আমাদের হযরত গাউছে পাক এর সুলুকিয়তের অবস্থার বর্ণনা। অর্থাৎ চুড়ান্ত একত্ব, একক, অপ্রকাশ্য, লুকায়িত হওয়ার কারণে যমানার কোন আউলিয়া কেরাম তোমার (সালেক) মত এবং তোমার শরীকদার হওয়া সম্ভব হবে না। আর তোমার কদম (পদক্ষেপ) সবার আগে এবং অগ্রগামী হবে। আল্লাহ্‌র সাথে তোমার যে প্রকৃত অবস্থা ও রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, কেউ তা জানতে পারবে না। সেই অবস্থায় তুমি প্রত্যেক রাসূল, নবী ও সিদ্দিকদের ওয়ারিস হয়ে যাবে। পয়গাম্বর ও ছিদ্দিকদের থেকে যা কিছু ইলম, দীন, পদবী, ইরশাদ, হেদায়ত সংক্রান্ত পদমর্যাদা বাকি রয়েছে, তা তোমার কাছে পৌঁছবে। কেননা বেলায়ত নবুয়তের ছায়া।

সিদ্দিকীয়তের মর্তবা নবুয়তের মর্তবার নিচের স্তর। উক্ত দু'টি স্তরের মধ্যবর্তী অন্য কোন স্তর ফাঁকা থাকে না। উক্ত কথাটি ঐ কথার দিকে ইঙ্গিতবহ যে, যখন সালেক (খোদাপথচারী) ঐ স্তরে পৌছেন, তখন তিনি প্রত্যেক তরিকার সমাবেশকারী রূপে পরিণত হন। তখন তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, তিনি উক্ত তরিকাসমূহ থেকে যে কোন একটিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। সমুচীন মনে করলে তাঁর গৃহিত তরিকায় হেদায়ত ও ইরশাদ এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। ইহাও তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, কয়েকটি তরিকাকে পরস্পর সন্নিবেশিত করে একটি সমন্বিত তরিকায় পরিণত করবেন। অথবা স্বীয় ইজতিহাদ (গবেষণা) এর মাধ্যমে যুগোপযোগী নতুন একটি তরিকা আবিষ্কার করে দক্ষ চিকিৎসক যেভাবে রোগের অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ দিয়ে থাকেন রোগাক্রান্ত ক্বলব ও রূহ সমূহকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত করবেন। তোমার মাধ্যমে বেলায়তের মর্তবার পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে। তোমার কামাল (পূর্ণতা) সকলের পূর্ণতার উপরে হবে। তোমার দিকে আবদালগণ প্রত্যাবর্তিত হবে। আল্লাহ্‌র অলিদের একটি দলকে আবদাল বলা হয়। আবদালদের মকাম বেলায়তের মকামের উপরে। আবদালের জন্য ওয়াজিব হল কুতুবের নিকট আসা এবং তাঁর সংস্পর্শে থাকা। আর তাঁর (কুতুব) নির্দেশনা অনুযায়ী আবদাল আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান সৃষ্টি জীবের মধ্যে কার্যকর করবেন। সেজন্য তাঁকে কুতুবে আবদাল বলা হয়। 'কুতুবে ইরশাদ' হল অপর বিষয়; খোদা পরিচিতি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাঁর (কুতুবে ইরশাদ) মহান সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কখনো একই ব্যক্তি কুতুবে আবদাল ও কুতুবে ইরশাদ হয়ে থাকেন। যেমন আমাদের হযরত গাউছুল্লাহিল আজম পৃথিবীর হাদি মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একই সাথে কুতুবে আবদাল ও কুতুবে ইরশাদ এর সমাবেশকারী ছিলেন। আপনার হিম্মতে কঠিন যন্ত্রনা ও বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়। আর আপনারই বরকতে লোকেরা সিক্ত হয় এবং জমীনে বর্ষন হয়।

আপনার অসিলায় ক্ষেতে শষ্য উৎপন্ন হয়। আপনারই সাহায্য ও সহযোগিতায় সমস্ত সাধারণ ও খাস লোকদের বিপদ-আপদ ও কষ্ট দূরীভূত করা হয়। সীমান্তের অধিবাসী; যেটি ইসলামী রাষ্ট্র ও কাফির রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অবস্থিত এবং মুসলমানগণ ঐ স্থানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর কাফিরগণও ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তাদের দাবিকে সমর্পণ করে না। সেই অবস্থায় আপনার অসিলায় মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে। চতুষ্পদ জন্তুর রাখাল, সম্প্রদায়ের শাসকদের এবং সাধারণ লোকেদের থেকে আপনার বরকতে বিপদ আপদ দূরীভূত হয়। আর رعيّت (রি'আয়ত) শব্দটি মূলত

জমীনের উপর বিচরণকারী প্রাণীদের অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং প্রচলিত অর্থে সাধারণ লোকদেরকেও রি'আয়ত বলা হয়। ঐ স্থানে উক্ত দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। ইমাম (দলের নেতা) ও সম্প্রদায় থেকে আপনার বরকতে বিপদ দূরীভূত হয়। "উম্মত" শব্দটি মূলত একই জাতীয় প্রাণীদের দলকে বুঝায়। আর শরীয়তের পরিভাষায় যেই দল বা জাতির কাছে পয়গাম্বর প্রেরিত হন, তাদেরকে উম্মত বলে। সমস্ত সৃষ্টি জীব থেকে আপনার বরকতে বিপদ দূরীভূত হয়। অতঃপর তুমি হয়ে যাবে শহরের কোতোয়াল ও বান্দাহদের রক্ষক। অতঃপর লোকেরা দ্রুতগতিতে ও ভ্রমণ করে তোমার কাছে আসবে; যাতে তারা তোমার থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয় এবং নিজ নিজ মকসুদ পূর্ণ হয়।

কবিতাংশ

হে উভয় জাহানের সুলতান! সৃষ্টিকূলে যত জগত রয়েছে,
সবার সমস্যা তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।
জগতে যত আজ খোদার ইশকে মাতাল,
হে শরাব পরিবেশনকারী! সবার মাতালতার সম্পর্ক তোমার ইশকের শরাবে।
খোদার কুতুব তুমি, খোদার গাউছ তুমি,
সবার ভরসা তোমার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর।

মানুষদের সাথে লেন-দেন, মানবসেবা, চাকরি-বাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তোমার হস্ত বেশি প্রসারিত হবে। সমস্ত সৃষ্টি জীবের স্রষ্টার হুকুমে প্রত্যেক অবস্থায় আমরা হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর গোলামদের মধ্যে হিংসা ও ঈর্ষার কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু খেদমতের বাসনা সবসময় ছিল, কেননা আসন্ন পংক্তিতে বলা হয়েছে -'খেদমত বিহীন ব্যক্তি কখনো খোদার তালাশকারী ব্যক্তি নয়'। আর খেদমত শুধুমাত্র পা মালিশ করার নাম নয়। বরং মহান দরবারের সাথে যতগুলি বিষয় সম্পর্কিত আছে সবগুলোই খেদমত। খেদমত দুইপ্রকার ; (১) সূরি (বস্তুগত), (২) মা'নবি (অবস্তুগত)। দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো আনজাম দেওয়াকে খেদমতে সূরি (صوري) বলে এবং জান-প্রাণ দিয়ে নিজেকে খেদমতে উৎসর্গ করাকে খেদমতে মা'নবি (معنوي) বলে। খেদমতের হাকিকত হল- প্রেমাস্পদের সত্তায় ফানা হওয়া। শরীর, মন, কথায় ও কাজে ফানা হওয়া।

গজল

আমি বিরহ বিচ্ছেদের বেদনায় পতিত, তুমি আমার সব,
আমার অন্য কোন দ্বার নেই, তোমার দ্বারই আমার ঘর।

আমার জানা নেই, আমি কি সামনে অগ্রসর হব, নাকি পশ্চাতে যাব,
আমি জানি যে, আপনার দয়া আমার জন্য যথেষ্ট।
আপনার দামানের আশ্রয় ছাড়া আমার যেহেতু কোন জায়গা নেই,
যদি আমি আপনার থেকে পালিয়ে যাই বাস্তবিক আমি কিভাবে অগ্রসর হব?
জান-প্রাণে সর্বদা আপনার হুকুমে উৎসর্গ। আপনার হাতে আমাদের লাগাম,
আপনার হুকুমে আমাদের কলম (তাকদীর)।
আমার মত গোনাহগারের এটা আশা যে, যদি আপনার দয়ার রাজ্যে আশ্রয় দেন
তাহলে আমি বাতেনী জ্ঞান লাভ করব।
যদি দোযখে প্রেরণ করেন। তাহলে, মীযানের দিকে চাহিব না,
কেউ যদি আপনার ব্যাপরে আমাকে বলে, তবে আমি বলব, তিনি ন্যায় বিচার করেছেন।
মকবুল আপনার হুকুমের তাবেদার ও আপনার দ্বারের ভিখারী,
আপনি যা ইচ্ছা হুকুম করুন, কেননা আপনি সবকিছুর হুকুম দাতা।

মানুষদের মুখে তোমার ভাল আলোচনা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন সব স্থানে জারি থাকবে। মানুষদের মুখে তোমার ভাল আলোচনা প্রশংসা ও স্তুতি প্রত্যেক মজলিশ ও মাহফিলে জারি থাকবে। তোমার বুজুর্গী, গুণাগুন এবং বেলায়তের ব্যপারে মুমীনদের দুই ব্যক্তি পরস্পরে মতবিরোধ করবে না। বরং সবাই ঐকমত্য সহকারে তোমার সুউচ্চ মর্যাদা এবং পরিপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতির প্রবক্তা হবে। আর ফরিয়াদ ও সাহায্য চাওয়ার প্রাক্কালে এইভাবে তোমার নিকট বলবে, "হে, ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি; যারা মরুপ্রান্তর ও আবাদী ভূমিতে বসবাসকারী এবং ইহাতে বিচরণকারী।" আমাদের হযরত গাউছে পাক মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুউচ্চ শান (মর্যাদা) এর ব্যপারে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যারা তাঁর বুজুর্গী ও কামালিয়ত (পূর্ণতা) এর প্রবক্তা ছিল না। কিন্তু চির দূর্ভাগা ব্যক্তি ব্যতীত। পূর্বোক্ত من اهل الايمان (ঈমানদারদের মধ্যে হতে) শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঐ কথার দিকে যে, যেই ব্যক্তি গাউছে যমানকে অস্বীকার করবে, অবিশ্বাস করবে এবং খারাপ আক্বিদা পোষণ করবে, প্রকৃতপক্ষে সেই বেঈমান ও পথভ্রষ্ট। বরং সে ইয়াহুদী ও নাসারার দলেও অন্তর্ভূক্ত নয়। হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁদের পথে যাঁদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট। আমিন।

কেননা অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এই কথার উপর একমত যে, الّذين انعمت عليهم (যাঁদের আপনি নেয়ামত দিয়েছেন)-এই আয়াতাংশ দ্বারা নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাহগণ উদ্দেশ্য। 'নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ

ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা কতই উত্তম সঙ্গী' (সূরা নিসা: ৬৯)। আর مغضوب عليهم (ক্রোধে-নিপতিত) দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইয়াহুদীগণ । কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ ইরশাদ করেন- "তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হল" (সূরা বাকারা: ৬১)। আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন- "যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত" (সূরা মায়েদা: ৬০)। আর ضالّين (পথভ্রষ্ট) দ্বারা উদ্দেশ্য হল খ্রীস্টানগণ।

এই প্রসংগে আল্লাহ ইরশাদ করেন- "যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে" (সূরা মায়েদা: ৭৭)। অতঃপর যে ব্যক্তি গাউছে যমান হন, তিনি নিংসন্দেহে ও সন্দেহাতীতভাবে নিয়ামত প্রাপ্তদের দলভূক্ত। অতএব, যে দূর্ভাগা তাঁকে অস্বীকার ও খারাপ অক্বিদা পোষণ করবে, অবশ্যই সে ইয়াহুদী ও নাসারার দলভুক্ত হবে। কেননা নিয়ামত প্রাপ্তদের বিরুদ্ধচারণকারীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র এখানে উক্ত দু'টি দলের উল্লেখ করা হয়েছে।

কবিতাংশ

নিশ্চিতভাবে সত্য যে, আপনার ভালবাসায় ঈমান হাসিল হল,
যে অন্তর আপনার ভালবাসা ধারণ করবে না উহা ক্ষতিগ্রস্থ।
যেই অন্তর গাউছে জমানকে অস্বীকারকারী হবে,
কুরআনের হুকুম মতে উহাই পৌত্তলিকতা ও ইহুদীয়ত।

অতঃপর উহা বুঝতে চেষ্টা কর। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'উহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাঁকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহকারী' (সূরা জুমুয়া: ৪)। সমস্ত নিয়ামত, কারামত ও দান সমূহ আল্লাহ্‌রই। এই রূপ আল্লাহ্‌র বান্দাদের ব্যপারেও তা প্রযোজ্য, খোদা তায়ালা বড় অনুগ্রহকারী। হযরত গাউছে পাক সুলতানে জিলান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র বাণী এখানেই শেষ হল।

গজল

হে গাউছে আজম! আপনি পৃথিবীর প্রাণ, সুদর্শনদের প্রেমাস্পদ,
আপনি খোদার নৈকট্য দানকারী খনির ঐ অনুপম মনিমুক্তা।
আপনি অদৃশ্যের অদৃশ্য ও সাধারণ নন। আপনি কার মত?
পৃথিবীতে আমি তালাশ করে দেখলাম যে, আপনার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি নেই।
আরবের সিংহাসনে যে প্রেমাস্পদ বাদশাহ হলেন তিনি একমাত্র ব্যক্তি (অর্থাৎ
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য),
নিশ্চিতভাবে পারস্য প্রান্তের খেলাফত আপনারই হাতে।
পৃথিবীতে আপনি কল্পনা প্রসূত সত্তা নন,

আপনিতো বেলায়তের ফুল বাগানের সুদর্শন ফুল।
পথভ্রষ্টতার অন্ধকার রাত্রিতে আপনি হেদায়তের প্রদীপ,
আপনি ইয়ালদা (শীতকালের দীর্ঘতম রাত্রির নাম) রজনীতে ফয়জের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।
আপনার শুভ দৃষ্টি দ্বারা উভয় জাহানের বিপদাপদসমূহ সমাধান করে দিন,
পৃথিবী বাসীদের জন্য আপনি নিশ্চিতভাবে বিপদাপদ দূরকারী।
আপনি মহান সত্তা; যিনি সমগ্র পৃথিবীর রহমত স্বরূপ এসেছেন,
বিপদসংকুল কিয়ামত ময়দানে আপনি একমাত্র সুপারিশকারী ব্যক্তি।
প্রত্যেক তদবিরকারীদের জন্য পৃথিবীতে তদবিরকারী আছে,
চিন্তিত মকবুলের (গ্রন্থকার) জন্য আপনিই সুদৃঢ় হাতল।

ষষ্ঠ ফরতু : প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) এর মিথ্যা দাবিদার শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে থাকে-এতদ্‌বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে

গোপন থাকে না যে, উপরোক্ত সুস্পষ্ট আলোচনা ও বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হক্কানী আলেম, আল্লাহ ওয়ালা, ফাযেল (মর্যাদাবান) ব্যক্তি এবং খোদা ও রাসূলের খলিফা ব্যতিত উল্লেখিত ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করা কখনো সম্ভব নয়। আর যে ব্যক্তি ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করা ব্যতিত খোদা ও রাসূলের খেলাফতের দাবিদার হয়ে নায়েব (প্রতিনিধি) দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে সে মিথ্যা দাবিদার। বরং সে হতভাগ্য, ঐ মিথ্যা বা বাতিল দাবির মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের সাথে শত্রুতা করে। বরং যেই ব্যক্তি বেলায়ত ও ইরশাদ (হেদায়ত) এর মিথ্যা দাবি করে, সেই শয়তানের খলিফা। যেমন ভণ্ড নবী মুসাইলামা কায্‌যাব।

'তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে" (সূরা আনয়াম: ৯৩)। আল্লাহ কতই পবিত্র! কি তামাশার ব্যপার যে, নিজেত পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং অপরকে হেদায়ত করতে প্রস্তুত। আর এটা জানেনা যে, বেলায়ত অর্জন এবং পরিপূর্ণ হেদায়ত দান এটা আল্লাহ ওয়ালা আলেম ও হক্কানী আউলিয়া কেরামদের উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ তায়ালার ফয়জ অর্জন কোন কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) ও মুকাম্মিল (পূর্ণতা দানকারী) ব্যক্তির মাধ্যম ব্যতীত কল্পনা করা যায় না।

কামিল ব্যক্তি বাতেনীভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের সাথে সম্পর্ক রাখেন যেমন রাসূল অথবা রাসূলের নায়েব (প্রতিনিধি)। সাধারাণ লোকদের বেলায় তা চিন্তা করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "বলুন, ফিরিশতাগণ নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ হতে উহাদের নিকট অবশ্যই ফিরিশতা রাসূল করে পাঠাতাম" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৫)। যেই ব্যক্তি আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ব্যতীত হেদায়ত তালাশের ইচ্ছুক হয়, সে চামচিকার মত অর্থাৎ সে চামচিকার মত পথ না দেখার অন্ধকারে নিপতিত।

যে কেউ খোঁড়া লেংড়া ব্যক্তিও আউলিয়া কেরামদের দিকে ধাবিত হল, তারা উক্ত দোষ সমূহ থেকে মুক্তি পেল এবং বাতেনী সমুদ্রে ডুব দিল। আল্লাহ! আল্লাহ! দুনিয়া থেকে ইনসাফ (ন্যায় বিচার) উঠে গেল। ইহাতো খারাপ ও ফ্যাসাদের যুগ। আল্লাহওয়ালা আলেম যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দুনিয়া

থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন মুসলমানীত্ব কিতাবের মধ্যে আছে এবং মুসলমানগণ কবরে আছেন। ইহা ভ্রষ্টতার যুগ, পথভ্রষ্টদের পথভ্রষ্টতা পছন্দ হয়। যেমন খারাপ প্রজা তেমন অত্যাচারী শাসক, যেমন অবাধ্য পশুপাল তেমনি অবাধ্য চারণভূমি। যেমন মৃত ব্যক্তি তেমন ফেরেশতা। বাতিলদের কথা বাতিলদের পছন্দ হয়। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা কথা ভাল মনে হয়।

বর্ণিত আছে যে, একজন কুটিল সমঝদার ছাত্র নাহু (আরবী ব্যাকরণ) এর একটি কিতাব নিয়ে একজন নাহুর শিক্ষকের কাছে গেল। শিক্ষক ضرب زيد عمروا (যায়েদ আমরকে মারল), উদাহরণ দিয়ে আরবী গ্রামারের কায়দা তাকে বলছিলেন। ছাত্রটি বলল, সে অপরাধ ছাড়া কেন মারল? শিক্ষক বললেন, যায়েদ ও আমর এর বিষয়টি একটি কাল্পনিক বিষয়। ইহা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে যায়েদ ও আমর শব্দদ্বয়ে হরকত (যের, যবর ও পেশ) এর বিষয়টি প্রকাশ পায়। আর এই কথাটি শিক্ষক ছাত্রটিকে বারবার বুঝাচ্ছিলেন। অতঃপর ঐ কুটিল সমঝদার ছাত্র স্বীয় শিক্ষকের কথা না মেনে জিজ্ঞাসা করল যে, কি অপরাধে যায়েদ আমর কে মেরেছে? তখন শিক্ষক অসহায় হয়ে বললেন, যায়েদ ও আমর দুইজন সহোদর ভাই এবং তিন তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। (অর্থাৎ যায়েদ ও আমর শব্দদ্বয় তিন অক্ষর বিশিষ্ট)। আমর যায়েদ থেকে একটি ওয়াও বর্ণ চুরি করে নিল (আমর [عمرو] এর শেষে একটি و [ওয়াও] অতিরিক্ত থাকে)। সেই কারণে যায়েদ সচেতন হয়ে আমরকে মেরেছে। যেহেতু সে সীমা লংঘন করেছে এবং শাস্তির উপযুক্ত হল। তখন কুটিল সমঝদার ছাত্রটি সেই বানানো কথাটি বুঝে নিল এবং পছন্দ করল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন- "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য" (সূরা নুর - ২৬)। অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য উপযুক্ত। দুশ্চরিত্রগণ দুশ্চরিত্রদের প্রতি আসক্ত, আর পবিত্রগণ পবিত্রদের তালাশকারী। মূলতঃ দুনিয়াদার আলেমদের চক্ষু দুনিয়ার গোবরে পোকার লালসায় অন্ধ হয়ে গেছে। দুনিয়াবী খড় কুটোর লোভে গোমরাহীর কূপে নিপতিত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা উহা বহন করে নাই, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ" (সূরা জুময়া- ৪)। অর্থাৎ ঐ লোকদের দৃষ্টান্ত তাওরাতের সাথে দেওয়া হল, তারা তা বহন করে নাই। অর্থাৎ তারা উহার উপর আমল করে না, যেমন গর্দভ; যে কিতাবের বোঝা বহন করে। দুনিয়াদার আলেমগণ অপরকে লোক দেখানো উপদেশ দেয়। যদি তাদের অন্তরে ঐ উপদেশের প্রভাব পড়ত,

তাহলে তাদের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যেত। ন্যায় কথা ইহা যে, যাদু বিদ্যার ক্ষেত্রে দৈত্যের নাম প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে দৈত্যদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের নাম কেন প্রভাব বিস্তার করে না? আর যদি তারা আল্লাহওয়ালা আলেম হত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পাকের নাম তাদের মুখে নিত। যাতে তাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত এবং প্রেম বিভোর অবস্থা সৃষ্টি হত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন- "মু'মিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।" (সূরা আনফাল: ২) অর্থাৎ নিশ্চয় পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যখন তার সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র জালালীয়ত ও আযমত এর প্রভাবে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। অথবা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামত সমূহের বিপরীতে স্বীয় আমলসমূহ কম হওয়ার কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। আর যখন তার সামনে তাঁর (আল্লাহ) আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় অর্থাৎ কুরআন শরীফ, তখন ঐ আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে।

ইহা থেকে স্পষ্ট হল যে, কুরআন তেলোয়াত দ্বারা তাদের ভিতরে নুরে ইয়াকীন (ঈমানের নূর) বৃদ্ধি পায় এবং বাহ্যিকভাবে তাদের মধ্যে আনুগত্যের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। জানা উচিত যে, ঈমানে হাকিকী একটি নুর বিশেষ। অন্তরের রন্ধ্র যতটুকু প্রশস্ত হবে, সেই পরিমাণ ঐ নুর অন্তরের মধ্যে চমকাতে থাকে। অতঃপর সেই সমস্ত ব্যক্তি আহলে দিল (ঈমানপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী), তাদের সামনে যখন কোরআন শরীফ তেলোয়াত করা হয়, তখন ইহার বরকতে তাদের অন্তরের রন্ধ্রগুলো বেশি খোলে যায় এবং ঈমানের নুর তাদের অনেক বেড়ে যায়। আল্লাহ্‌র জামালিয়ত (সৌন্দর্য্য) এর নুরে তারা ডুবে যায়। আর তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের উপর নয়। কেননা, যে কেউ আল্লাহ্‌র নূরের আধিক্যের হামলায় পরাভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাঁর আল্লাহ ছাড়া কারো পরওয়া থাকে না। বরং তাঁর দর্শন চক্ষে আল্লাহ ছাড়া কেউই আসে না।

মসনবী

যে কেউ শুহুদের (খোদার দর্শন) সমুদ্রে নিমজ্জিত হল,
সে হক তা'য়ালাতে নিমজ্জিত হল এবং নিঃসন্দেহে সে জাহাজ ও নৌকা থেকে মুক্ত হল ।
যে সাগরে ডুবল সে সাগর ছাড়া কিছুই দেখল না,
সমুদ্র ছাড়া আর যা কিছু হোক না কেন তাতে অদৃশ্য হও।

যদি ন্যায় চক্ষে দেখ এবং মনোযোগ প্রদান করে দেখ, তাহলে দুনিয়াবাসীদের ঈমানের মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত আয়াত শরীফে انّما (ইন্নামা) শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইহা সীমাবদ্ধ করণ অর্থ প্রদান করে, যদিও যাহের ইসলামের মুফাসিসরগণ ইহাকে সম্মানসূচক শব্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আরেফ রুমি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

দুনিয়াদাররা সাধারণভাবে অবিশ্বাসী-দিন রাত নির্লজ্জ কাজে জড়িত।

সপ্তম ফরতু : দুনিয়াবাসীদের গোমরাহীর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে

জানা উচিত যে, দুনিয়াবাসী বা দুনিয়াদারদের গোমরাহীর কারণ যদিও অনেক, কিন্তু তম্মধ্যে তাদের পথভ্রষ্টতার দু'টি কারণ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুস্পষ্ট। প্রথমটি হল- লোভ-লালসা। রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার ব্যপারে ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় ধর্মের উৎস হল খোদাভীরুতা এবং উহার ধ্বংসযজ্ঞ হল লোভ-লালসা।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক পাপের মূল"। অপর একটি হাদিস শরীফে আছে- "সমস্ত পাপের মূল হল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং সমস্ত ফিতনা ফ্যাসাদের মূল হল উশর (ভূমির ফসলের যাকাত) ও যাকাত না দেওয়া।" ইয়হিয়া বিন মুয়াজ নামক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত আছে, "দুনিয়ার পুরোটাই ত্যাগ করাই হল আখেরাতের পুরোটাই গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরোটাই ত্যাগ করল, সে আখিরাতের পুরোটাই গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরোটাই গ্রহণ করল, সে আখেরাতের পুরোটাই ত্যাগ করল। অতঃপর আখিরাতকে গ্রহণ করা হল দুনিয়া ত্যাগ করা এবং আখিরাত ত্যাগ করাই হল দুনিয়া গ্রহণ করা"।

মসনবী

দুনিয়ার ভালবাসা সমস্ত অপরাধের মূল,
উশর ও যাকাত না দেওয়া দূর্দশার মূল।
হে যুবক! যদি তুমি পরকালকে স্থায়ী আবাস হিসেবে চাও,
ইয়াহইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পক্ষ থেকে এই কথাটি মন দিয়ে শুন।
বল, দুনিয়া ত্যাগ করছি, যাতে উহা ত্যাগ করতে পার,
হে যুবক! তবে তুমি পরকাল হাসেল করতে পারবে।
দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালকে শক্তভাবে ধর।
সমগ্র দুনিয়াকে যে আকড়ে ধরেছে,
সমস্ত পরকাল তার হাত থেকে চলে গেছে।

দ্বিতীয়টি হল আউলিয়া কেরামদেরকে (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) নিজের বিবেচনায় কিয়াস (অনুমান) করা। এইরূপ বিবেচনা করা আউলিয়া কেরামদের ফয়জের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আগের যুগের কাফিরগণ আম্বিয়া ইজামদের (আলাইহিমুস্সালাম) নিজেদের অনুরূপ অনুমান করার কারণে চিরন্তন পথভ্রষ্টতার খাদে নিজেদের নিপতিত করেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কেননা একটি প্রবাদ আছে, "ব্যক্তি নিজের উপর অপরকে অনুমান করে।" কাফিরগণ বলত, "তোমরা

আমাদের মতই মানুষ।" (সূরা ইয়াসীন-১৫) এবং তারা বলত, "এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে।" (সূরা ফুরকান: ৭)।

মসনবী

বুজর্গ লোকের কাজ দেখিয়া নিজের কাজের উপর 'কিয়াস' (অনুমান) করিওনা,
কেননা, খেয়াল করিয়া দেখ, যদিও শব্দ 'শীর (شیر)' ও 'শের(شیر)' লিখনে একই বানান ।
শীর (দুধ) উহাকে বলে যাহা মানুষ পান করে,
শের উহাকে বলে যেটি মানুষকে ছিড়ে খেয়ে ফেলে।
শীর (দুধ) উহাকে বলে যা পেয়ালায় থাকে,
শের (সিংহ) উহাকে বলে যেটি জঙ্গলে থাকে।
সমগ্র জগত এই কারণে গোমরাহ হয়েছে যে,
তারা আল্লাহ্‌র আউলিয়া সম্পর্কে অনবগত।
কাফিরদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল না,
তাই তারা ভাল ও মন্দকে সমান মনে করত।
নবীদেরকে (আলাইহিমুস্‌সালাম) তারা নিজেদের সমতুল্য মনে করত,
আউলিয়াদেরকে নিজেদের মত মনে করত।
তারা বলত আমরা মানুষ, তোমরাও মানুষ,
উভয়ের মধ্যে পানাহারের প্রভাব রয়েছে।
তাদের অন্তর ত্যাড়া বাঁকা ছিল, তাই তারা তাঁদের (নবী ও আউলিয়া) রাজ-রহস্য বুঝতে পারেনি,
তারা তা পরখ করে দেখেনি।
উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য,
শয়তান ও ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য যেরূপ, তাদের মধ্যে পার্থক্য সেরূপ।
মৌমাছি ও বল্লা দুইটি পোকা একই বস্তু পান করে,
কিন্তু একটিতে শুধু কাটিতে জানে, অন্যটি মধু দান করে।
উভয়ে একটি স্থান থেকে পানি পান করে,
তম্মধ্যে একটি খালি এবং অপরটি মিষ্টিতে পূর্ণ।
দুই প্রকার হরিণ প্রত্যেকেই জঙ্গলের ঘাস খায় ও পানি পান করে,
এক প্রকার শুধু লাদই পায়খানা করে, অন্য প্রকার হতে মেশক আম্বর পাওয়া যায়।
এই রকম শত সহস্র উদাহরণ দেখা যায়
এবং উভয়ের মধ্যে সপ্তাহ ও বছরের ব্যবধান রয়েছে।
তারা (কাফির) যা খায় তা থেকে অপবিত্রতা বের হয়,

আর তাঁরা (নবী ও আউলিয়া) যা খায় তা খোদার নুর হয়ে যায়।
তারা (কাফির) যা খায় তা থেকে কৃপণতা ও হিংসা বের হয়,
আর তাঁরা (নবী ও আউলিয়া) যা খায় তা এক খোদার নুর হয়ে যায়।
তাঁরা (নবী ও আউলিয়া) কর্পুর (সুগন্ধি) এর মত,
তারা (কাফির) লবণাক্ত জমির মত। তাঁরা ফেরেশতার মত এবং তারা
(কাফির) অপবিত্র শয়তানের মত।
যদিও উভয় গঠন আকৃতিতে একই রকম,
কিন্তু একটি লবণাক্ত এবং অপরটি স্বচ্ছ মিষ্টি।
যার স্বাদ গ্রহণের শক্তি ঠিক আছে, সেই-ই ইহা পার্থক্য করতে পারবে যে,
কোন পানি মিঠা আর কোন পানি লবণাক্ত।
যার স্বাদ গ্রহণের শক্তি ঠিক আছে,
সেই ইহার স্বাদ বুঝতে পারবে এবং উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তা জানবে।
ফেরআউন যাদুবিদ্যা এবং নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম) মোজেজাকে এক রকম বলে
ধারণা করেছে,
উভয় কাজকে ধোঁকাবাজি ও সম্মোহনী বলে ধারণা করেছে।
ফেরআউনের যাদুকরগণ হজরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) এঁর লাঠির সম্মুখে
তাদের লাঠি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্যত হয়েছিল।
যদিও উভয় লাঠি একই রকম ছিল,
কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সীমাহীন।
হজরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) এঁর আমল ও যাদুকরদের আমলের মধ্যে
তুলনা ছিল না, তিনি হজরত মুসা আলাইহিস্সালাম) ছিলেন সত্য পথে, আর
তারা ছিল পথভ্রান্ত।
হজরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) এঁর আমলের প্রতি খোদার রহমত নাযিল হত,
আর যাদুকরদের আমলের প্রতি খোদার অভিশাপ নাযিল হত।
কাফেরগণ আউলিয়াদের কাজের সাথে বানরের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে,
সেই কারণে আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হয়েছে।
বানর শুধু হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষে যা করে তা অনুকরণ করে
এবং প্রকাশ্যভাবে মনে করে যে, আমিও মানুষের সমকক্ষ হলাম।
অনুরূপভাবে কাফিররা ধারনা করে যে,আমরাও তাঁদের মত কাজ করি,
তাই, আমরা ও খায়রে আনাম (সর্বশ্রেষ্ট মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) একই মর্যাদা সম্পন্ন।
উনারা (মুমীনরা) আল্লাহ্র হুকুমে কাজ করেন,
তারা (কাফিররা) হিংসার বশবর্তী হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

ঐ মুনাফিকগণ মুমিনদের মত নামাজ পড়ে,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ চলছে।
উভয়ে হজ্ব, যাকাত ও সালাত আদায় করে,
কিন্তু একটি দল (মুমীন) খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে জয়ী হচ্ছে, অপর দল
(মুনাফিক) ব্যর্থ হচ্ছে।
কখনো তারা উভয়ে উত্তরাধিকার সুত্রে সমান হতে পারে না,
মুমীনগণ খোদায়ী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন, আর মুনাফিকগণ ব্যর্থ হয়।
যদিও তারা উভয়ে একই খেলায় মগ্ন,
কিন্তু উভয়ের অন্তরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
তাদের উভয়ের মকাম (স্তর) ভিন্ন,
প্রত্যেকেই এক একটি নামে বিভূষিত।
প্রত্যেকে স্বীয় মকাম (স্তর) এর দিকে ধাবিত হয়,
প্রত্যেকে স্বীয় নাম অনুযায়ী কাজ করে।
যদি কোন ব্যক্তিকে মুমীন বলা হয় তবে সে অত্যন্ত খুশি হয়,
আর যদি কাউকে মুনাফিক বলা হয় তবে সে রাগে অগ্নিবত রূপ ধারণ করে।
তাঁর (মুমীন) নাম তাঁর সত্তাগত কারণে তাঁর কাছে অধিক প্রিয়,
অপরদিকে তার (মুনাফিক) নাম তার দুষ্কর্মের কারণে তার কাছে অধিক অপ্রিয় ও দোষণীয়।
মীম, ওয়াও, মীম ও নুন দ্বারা মুমিন শব্দটি গঠিত (শব্দগতভাবে এর কোন বুজুর্গী নাই),
মুমিন শব্দটি শুধু এতটুকুতেই চেনা যায়।
কেউ যদি তাদের মুনাফিক বলে,
তখন বিচ্ছুর মত তার কলিজায় সর্বদা হুল ফুটায় অর্থাৎ সে রাগান্বিত হয়।
যদিও এই নামটি (মুনাফিক) দোযখ থেকে আসেনি,
তারপরও কেন দোযখীদের মত তারা কাজ করে।
নামের দোষ বর্ণের কারণে নয়, যেমন পানির লবণাক্ততা পাত্রের কারণে নয়।
এখানে বর্ণ হল পাত্র এবং পানি হল অর্থ সদৃশ,
আর অর্থকে উম্মুল কিতাব (লাওহে মাহফুজ) এর পাল্লায় পরিমাপ কর ।
সমুদ্রের মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি এক সাথে প্রবাহমান,
উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরাল রয়েছে যা তারা অতিক্রম করে না।
জেনে রাখ যে, পানির এই দুইটি ধারা একই উৎস থেকে প্রবাহিত,
তুমি ইহার শাখা ছেড়ে উৎসের দিকে প্রত্যার্পন কর।
খাঁটি স্বর্ণ ও ভেজাল স্বর্ণ দেখতে একই রংয়ের দেখায়,
তবে স্বর্ণকে কষ্টি পাথরে একবার পরীক্ষা করে দেখ এতে খাঁটি স্বর্ণ চেনা যায়।
আল্লাহ তায়ালা যার অন্তরে কষ্টি পাথর (জ্ঞানের আলো) দিয়েছেন,

নিঃসন্দেহে তার বিশ্বাস স্থাপন হবে।
মকবুল (গ্রন্থকার) আল্লাহ্‌র বন্ধু গাউছুল আজমের জন্য জান-প্রাণে উৎসর্গিত,
যে ব্যক্তি জান-প্রাণে তাঁর উপর উৎসর্গিত হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র দিদার পাবে।
তুমি এখানে তোমার কলম থামাও,
এখন গাউছে খোদার অবস্থা বর্ণনা কর।

গজল

বসন্তের মৌসুম এসেছে, আমি কি করে তা ত্যাগ করি,
ইশকের [প্রেম] শরাব পান করে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেব।
এখন তপস্যা ও খোদা ভীরুতার জ্ঞানকে আনন্দদানকারী কোথায়,
আত্মোৎসর্গকারী বীণার (বাদ্যযন্ত্র) আওয়াজের মত আওয়াজ করতে থাকব।
পরহেযগারের পরহেজগারীতা ও জ্ঞান দ্বারা এখন আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে গেছে,
এখন জান-প্রাণ দিয়ে মাশুক (প্রেমাস্পদ) এর খেদমত (সেবা) করতে থাকব।
এখন আমি আমার অন্তরের পানশালায় মুরিদ হব,
আর ইশকের শরাব পান করে পথ অতিক্রম করব।
কলমা পড়ে পানশালার পীর হব এবং
বাকি জীবন শরাব পানকারীদের সাথে পথ অতিক্রম করব।
হে শরাব পরিবেশনকারী! মাতালতা বৃদ্ধিকারী এক পেয়ালা শরাব দাও,
যাতে আমি জামশেদ (প্রাচীন পারস্য সম্রাট) ও কায়কাউস (ইরানের নামকরা
বাদশাহ) সম্রাটের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারি।
হে গাউছে খোদা! মকবুল (গ্রন্থকার) এর উপর তোমার অন্তর্দৃষ্টি পতিত হোক,
যাতে একবার ভাগ্যকে সৌভাগ্যময় করতে পারি।

প্রথম জলওয়া (দীপ্তি): হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং ইহাতে সাতটি ফরতু (রশ্মি) রয়েছে। প্রথম ফরতুঃ মহান রহস্যের আধার হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্মের স্বপ্নের বর্ণনা

প্রকাশ থাকে যে, সুউচ্চ শান-শওকতের অধিকারী হযরত গাউছে পাক হাবিবে খোদা লাওলাকা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বর্ণনা বর্ণনাকারীদের থেকে উত্তম। সূর্যের আলোই স্বয়ং সূর্যের জন্য দিশারী।

কবিতাংশ

সূর্য নিজেই সূর্যের দলীল।

পংক্তি

হে মর্যাদাবান! আপনার প্রশংসা করি বা না করি,
সুদর্শন প্রেয়সীর পরিচারিকার কি দরকার।

যাঁকে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে অনাদিকাল হতে সমুজ্জ্বল সত্তা দান করেছেন,
বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তাঁর কি প্রয়োজন এবং তৈরিকৃত গয়না ও অলংকার তাঁর কি দরকার?

গজল

কে সেই ব্যক্তি যে গাউছে আজমের মকান (মর্যাদা) সম্পর্কে জানে,
তবে সে ব্যক্তি তার জ্ঞান ও উপলব্ধি দ্বারা ভাল জানে।
তাঁর রাজ-রহস্য আপনার পার্থিব দাস কি করে বলবে,
নিশ্চিতভাবে আপনার রাজ-রহস্যের ব্যাপারে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।
ফেরেশতা ও আদম জাতির মধ্যে কেউ তাঁর অতল রহস্য সম্পর্কে জানে না,
তাঁর খোদা তাঁর সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন।
প্রকৃতপক্ষে, খোদার দর্শনকারী সূর্য ঢলে পড়ে না,
পবিত্র আকৃতিতে ও পূর্ণ সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত গাউছে আজম তা (খোদার রাজ-রহস্য) জানেন।
তাঁর পবিত্র সত্তার গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ উভয় জাহানে বিদ্যমান,
তাঁর ইরফানি সমুদ্রের পরিচিতি সম্পর্কে খোদার সম্মানিত বান্দারা জানেন।
মকবুল (গ্রন্থকার) যদি তাঁর সম্মানিত আস্তানার মাটি সম্পর্কে জানে,
তাহলে সুউচ্চ আরশ পানে মাথা উত্তোলন করল।

আহমদী সৌন্দর্য্যের প্রেমে দিশেহারা এবং চিরন্তন প্রেমাস্পদের আগ্রহীদের জন্য হযরতের পবিত্র আলোচনা হৃদয়ের ব্যথা নিরাময়ের প্রতিকার স্বরূপ। বরং গাউছিয়তের গুণাগুণ বর্ণনা শরীর ও প্রাণের প্রাণ স্বরূপ এবং হযরতের স্মরণই হল বিশ্বাসের সারবস্তু এবং ঈমানের মগজ ও উৎস।

পংক্তি

সুমহান আরশের সূর্য হিসেবে গাউছে মাইজভাণ্ডার থাকবেন,
হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) অন্যান্য ফেরেশতাসহ ঘোড় সওয়ার হয়ে আসলেন।
জেনে রাখ, ব্যাকুল অন্তরের বিরহ বেদনা তোমার স্মরণে স্থিতিশীলতা লাভ করে,
দুঃখ ভারাক্রান্ত ইশকের জন্য তোমার নামই দুঃখ দূরকারী।

গজল

হে প্রেমাস্পদ! চিত্তাকর্ষক প্রেম অন্তঃস্থলে পরিয়ে দাও,
তুমি হলে সৌন্দর্য্যের শাহানশাহ (বাদশাহ), তুমি আমাদের প্রাণ সমূহের প্রাণ।
আমি প্রথম আর তুমি শেষ, আমি প্রকাশ্য আর তুমি অপ্রকাশ্য,
সমগ্র জগতের মানব চোখের দর্শন তুমি।
আমরা অন্তরের ইশকে জ্বলছি, পেরেশান ও দুঃখ আমাদের প্রাণের ব্যাথাকে বাড়িয়ে দিয়েছে,
ফলে আমরা কান্না করছি, আর তুমি অন্তরের ব্যথা দূরীভূতকারী ঔষধ স্বরূপ।
আমি লায়লা, তুমি মাজনুন, আমি ফরহাদ, আর তুমি শিরীন,
আমরা প্রেমিকদের সৌন্দর্য ও সম্মানের তরবারি এবং চোখের পাতা তুমি।
আমাদের ফুলবাগানের ফুল হলে তুমি, অন্তরের বুলবুলি পাখি চিৎকার করে উঠল,
আমরা বাগানের বুলবুলি পাখির গোপন আর্তনাদ তুমি।
আমরা খোদাভীরুদের সুদৃঢ় বন্ধন ও তাসবীহ হলে তুমি- কাল্পনিক কা'বায় গুপ্ত মন্দির হলে তুমি।
আমাদের সুগভীর অন্তরের সুপ্ত পদ্মরাগ মণি ও ইয়াকুত পাথর হলে তুমি,
আমরা তরঙ্গ আর তুমি সমুদ্র, আমরা হলাম মুক্তা আর তুমি উহার দীপ্তিমানতা।
গাউছে মাইজভাণ্ডারীর স্বর্গীয় পোশাক দ্বারা আমাদের অন্তরকে সুশোভিত কর,
অসহায়দের সহায়, আশ্রয়স্থল ও পাথেয় তুমি।
মকবুলের (গ্রন্থকার) হৃদয়ের তুমি পরম অধিশ্বর,
এক পলকে যদি প্রাণ নির্গত হয়ে যায় তাহলে তুমিই আমার আশ্রয়স্থল।

এখন হযরত গাউছে আজম নুরে আলম কুতুবে আফখম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অবস্থার কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনুন

স্বীয় প্রাণের মস্তিষ্ককে ঈমানের সুগন্ধি যুক্ত করে সুগন্ধযুক্ত কর এবং হৃদয়ের ঘ্রাণশক্তিকে তাঁর বিশ্বাসের সুগন্ধি দ্বারা আম্বর মিশ্রিত সুগন্ধিতে পরিণত কর। মহামান্য গাউছিয়তের ধারার বেলায়তের অধিকারী হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ছোট ভাই জনাব মহামান্য মৌলভী শাহ ছৈয়দ আব্দুল করিম ছাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) বর্ণনা করেন, আমি স্বীয় সম্মানিত পিতা আল্লাহর আ'রেফ জনাব মৌলভী শাহ ছৈয়দ মতিউল্লাহ ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ফরদুল্লাহেল আকরম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জম্মের কিছুকাল পূর্বে একদা রাত্রি বেলায় এশার নামাজের পর এবং রাত্রিকালীন ইবাদতের পর অবসর হয়ে বিছানায় নিদ্রাভিভূত হলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি আলমে মালকূতে-ফেরেশতা জগতে ভ্রমণ করতেছি। অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালার বাস্তব রহস্যের দ্বার উৎঘটিত হল। তিনটি আলোক প্রদীপ আমার সামনে উপস্থিত হল। আল্লাহ্‌র কালামের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব রহস্যের আলোকে যেন আমাকে অবগত ও সতর্কবাণী দেওয়া হল। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত।" (সূরা নূরঃ ৩৫)।

তম্মধ্যে প্রথম প্রদীপের আলো থেকে দ্বিতীয় প্রদীপের আলো ছিল অত্যুজ্জ্বল। প্রথম দু'টি প্রদীপের আলোর তুলনায় তৃতীয় প্রদীপের আলো ও উজ্জ্বলতা ছিল সূর্যসম জ্যোতির্ময়, উহার আলোতে যেন আর্শ, আসমান-যমীন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছু আলোকিত হয়ে গেল। এই স্বপ্ন থেকে জেগে উঠার পর আমার মনে প্রাণে যেন এক অভিনব আনন্দ স্পন্দন জেগে উঠল এবং আমার অন্তরে এমন আনন্দ উদয় হল যেন আনন্দে মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হল। যদিও নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ আমার জানা ছিল। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন উহা পাহাড়কে চুর্ণ বিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।" (সূরা আ'রাফঃ ১৪৩)।

গজল

ইহা আমি স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় দেখলাম,
অন্তরের ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠিত অবস্থার প্রাক্কালে ইহা দেখলাম।
ইহা হল আল্লাহ্‌র প্রদীপ অথবা ইহা হল হেদায়তের রাত্রির পূর্ণ চন্দ্র,
ইহা হল জগতের রহমতের প্রবাহিত ঝর্ণা।
তিনি খোদার অনুগ্রহে কোন একটি বাহানা বানিয়ে আগমন করতেছেন

অথবা ইহা রহস্যপূর্ণ মাসহাফ (আসমানী গ্রন্থ) হতে একটি নুর অথবা রশ্মি আগমন করতেছেন।
ইহা বেহেশতের হুরদের দ্যুতি বা আলোকস্বরূপ অথবা ইহা খোদার অনুগ্রহ।
ইহা হলেন নুরের গম্বুজ অথবা ইহা হলেন আকাশের ধ্রুবতারা।
ইহা হল আকাশের সূর্য অথবা সুমহান আরশের প্রদীপ
অথবা ইহা হল গাউছে মাইজভাণ্ডারী; যিনি পবিত্র চেহারা মোবারকের শোভা।
তাঁর নুরী চেহারায় সবকিছু উজ্জ্বল
অথবা মকবুলের কাছে ইহা হল আল্লাহ তায়ালার নুরী তজল্লীর ঝলকানী।

প্রত্যুষে তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মৌলভী আব্দুল হাদী ওরফে বাণ্ডী চাঁদ মিয়াজী ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর নিকট গেলেন এবং স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাঁর নিকট খুলে বললেন। তিনি ঐ স্বপ্নের রহস্য শুনে বাগানের বুলবুলি পাখির মত আরোগ্য লাভের উপদেশ সূচক কথা যা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থে রয়েছে, তাঁকে বলেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "আপনি আপনার ভাইদের কাছে এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলবেন না।" (সূরা ইউসুফ: ৫)। তিনি (মওলানা আবদুল হাদী) বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নকে সামান্য স্বপ্ন হিসেবে ছেড়ে দিও না এবং কোন হীন, অযোগ্য ব্যক্তিকে এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলবে না। আর উক্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্য ভরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, আপনার পবিত্র ঔরশ এবং সম্মানিত বংশে তিনটি উজ্জ্বল রত্ন ও উজ্জ্বল প্রদীপ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ফজল ও অনুগ্রহে এমন তিনজন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। তন্মধ্যে দুই-সন্তান অত্যন্ত পরহেজগার ও খোদার মা'রেফতের অধিকারী হবেন এবং সৎকর্মশীল পুরুষের সৎকর্মশীল উত্তম সন্তানের মত রাজ রহস্যের উন্মোচনকারী হবেন।

আর একটি রত্ন তন্মধ্যে তুলনাহীন হবে, যাঁর আধ্যাত্মিকতায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিশ্বভূবন এমন আলোকিত ও উজ্জ্বল হবে, সেই আলোতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল হয়ে যাবে। আর এমন একটি উজ্জ্বল পৃথিবীর দীপ্তিমান সূর্য জন্মগ্রহণ করবেন, যাঁর আধ্যাত্মিকতায় জগতের মহাকাশ পৃষ্ঠ থেকে সমস্ত বিশ্বভূবন উজ্জল হয়ে যাবে। যাঁর সৌন্দর্য্যের রশ্মিতে সমগ্র পৃথিবী সহ সমগ্র খোদায়ী জগত আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়ে যাবে।

কবিতাংশ

স্বপ্নের পরীরা স্বীয় সৌন্দর্য দর্শনে জগতে খুশিতে মত্ত থাকে,
আপনার দাস প্রিয়তমের সৌন্দর্য দর্শনে আনন্দে মাতোয়ারা।
আল্লাহ তায়ালা খুব দয়ালু ও প্রেমময়, অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেললে প্রদীপ,

চন্দ্র ও তারকার নুরের ঝলওয়া অনুমান করা যায়।

গজল

সৌন্দর্য্যের ঝলওয়া (দীপ্তি) হতে আপনি ফয়জের সমুদ্র জারি করে দিন।
জগতের ফুল বাগানে আপনার থেকে ফয়জের বসন্ত এসেছে।
এক চন্দ্র মাস থেকে অপর চন্দ্র মাস পর্যন্ত, আরশ থেকে জমিন পর্যন্ত জীন,
মানব, হুর ও ফেরেশতা সবাই আপনার জন্য উৎসর্গীত।
আপনি হলেন সম্মানিত সত্তার অধিকারী এবং স্বয়ং ফয়জের উৎস।
আপনার অনুগ্রহের উপর ফয়েজ নির্ভরশীল।
স্বীয় উদ্দেশ্যের চেহারা কেউ কখনো দেখবে না,
যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ফয়েজ সমৃদ্ধ চেহারা থেকে অবগুণ্ঠন সরাবে না।
জগতের পবিত্র ব্যক্তিগণ খোদায়ী অনুগ্রহের ফাঁদ সম্পর্কে জানেন,
আর ফয়জের পূর্ণ অপেক্ষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা পূর্ণতা পায়।
মকবুল তাঁর পবিত্র জাতের রহমতের বৃক্ষ,
চতুর্মুখী ফয়জের ফোয়ারা তাঁর পাত্রে যেন পৌঁছে।

উপকারিতা

তাফসীরে নুক্বরাকারে সূরা ইউসূফ (আলাইহিস্সালাম) এঁর তাফসীরে লিপিবদ্ধ আছে, বর্ণিত আছে যে, আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর শাসনামলে একবার হযরত আমিরুল মুমেনীন আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) এঁর সাক্ষাত প্রার্থী হলেন এবং হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। প্রথমটি হল এই যে, কখনও দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করল এবং ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা, প্রেম, এবং বন্ধুত্ব পরস্পরের মধ্যে প্রকাশিত হল অথচ ইতিপূর্বে কখনও পরস্পরে পূর্বের কোন বদান্যতা তাদের মধ্যে ছিল না, তার কারণ কি? কখনও দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা পোষণ করে এবং একে অপরের সাথে শত্রুতা মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে অথচ ইতিপূর্বে কখনও উভয়ের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক ছিল না, ইহার কারণ কি? হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইরশাদ করেন, আমি হযরত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এইরূপ শুনেছি যে, প্রতিশ্রুতির দিন যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর সমস্ত সন্তানদের তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তন্মধ্যে কতেক সন্তান পরস্পর মুখোমুখি দণ্ডায়মান হলেন এবং কতেক সন্তান পরস্পর বিপরীতমুখী পিঠাপিঠ দণ্ডায়মান হলেন। অতএব, যাঁরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দুনিয়াতে একে অপরকে চিনে এবং পরস্পর

বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে এবং যারা বিপরীতমুখী পিঠাপিঠ দাড়িয়েছিল, ইহার প্রভাব দুনিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তারা পরস্পর শত্রুতা ও দুশমনি মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল এই যে, মানুষ কখনও কোন কথা শুনে এবং তা স্মরণ থেকে যায়। আবার কখনও কোন কথা শুনে তা অন্তর থেকে ভুলে যায় এবং হৃদয় থেকে মুছে যায়, ইহার কারণ কি? আমিরুল মুমেনীন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইরশাদ করেন, আমি রাসূল মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, হৃদয়ের অনেক পর্দা রয়েছে, যখন ঐ পর্দা অন্তরের মুখ থেকে তুলে দেওয়া হয়, তখন যা কিছু ব্যক্তি শ্রবণ করে তা স্মরণ থেকে যায় এবং যখন ঐ পর্দা হৃদয়কে ঢেকে নেয়, তখন ব্যক্তি যে কোন কথা শুনলে তা ভুলে যায়। তৃতীয় প্রশ্নটি হল এই যে, ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে এবং ঐ স্বপ্ন কখনও বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আবার কখনও তা তার দেখা স্বপ্নের বিপরীত হয়। ইহাতে কি হেকমত রয়েছে? হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইরশাদ করেন, আমি শুনেছি, হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার রূহ (আত্মা) কে স্বপ্নের সময় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয় না এবং রূহ উপরের দিকে গমন এবং নিচের দিকে অবতরণের সময় অনেক কিছু দেখে থাকে। যা কিছু আসমানের নিচে দেখে তাতে শয়তানের অনুপ্রবেশ থাকে এবং বিকৃতির আশংকা থাকে। সেজন্য স্বপ্নটি বাস্তবের বিপরীত হয়ে থাকে এবং যা কিছু আসমানের উপরে দেখে থাকে তাতে শয়তানী প্রভাবের আশংকা থাকে না এবং সেজন্য স্বপ্নটি বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। যখন আমিরুল মমেনীন হযরত আলী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) থেকে যথাযথ উত্তর পেলেন, তখন তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন এবং খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যাঁকে স্বপ্নের ফেরেশতা বলা হয়। হযরত আদম (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর যমানা থেকে আদম সন্তানদের প্রত্যেক ব্যক্তির চোখের মোকাবেলায় ঐ ফেরেশতার সীমাহীন জগত জুড়ে অসংখ্য চক্ষু আছে। এই সব চক্ষু এই পৃথিবীর দিকে খোলা অবস্থায় আছে এবং তাঁর (ফেরেশতা) অপর একটি চোখ আছে, যেটি এত বড় যে, সেটির প্রশস্থতা সমস্ত পৃথিবীর প্রশস্থতার সমান এবং উহা লাওহে মাহফুজ এবং সুমহান আরশের দিকে খোলা অবস্থায় আছে। ঐ চোখ দ্বারা অদম (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর প্রত্যেক সন্তানদের সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ থাকে তা পড়ে থাকে। ফেরেশতাটির যেই চক্ষু দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির

দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে, তাকে স্বপ্নে লাওহে মাহফুজ ও আরশে যা কিছু লিখা থাকে তা দেখায়। এমন কি সুখ-দুঃখ যা কিছু হবার রয়েছে, তা বাস্তবে রূপ নেয়। যদি স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারী মুমীন হয়, তাহলে ঐ স্বপ্ন তাঁর (ফেরেশতা) কেরামত। আর যদি স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারী কাফির হয়, তাহলে তা তার জন্য সর্তকতামূলক সংকেত। আর যেই স্বপ্ন খুশি ও আনন্দের উপকরণ হিসেবে মুমীনকে দেখানো হয়, তখন ইহাতে শয়তানের হিংসা চলে আসে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারীকে জাগিয়ে দেয় এবং স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তখন স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারী মুমীন ব্যক্তিটির আপসোস হয় যে, হায়! একটি ভাল স্বপ্ন দেখছিলাম এবং তাড়াতাড়ি জেগে গেলাম। আবার কখনও শয়তান স্বপ্নের কতেক বিষয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং সে মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশ্রিত করে দেয়। অলেমগণ বলেন, দশ প্রকারের স্বপ্ন ফেরেশতাদের সাথে নির্দিষ্ট, যাতে শয়তানের কোন দখল থাকেনা। প্রথম- ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাতের স্বপ্ন, দ্বিতীয়-আম্বিয়াদের (আলাইহিমুস্সালাম) সাথে সাক্ষাতের স্বপ্ন। তৃতীয়-কুরআন দেখার স্বপ্ন। চতুর্থ- আসমান দেখার স্বপ্ন। পঞ্চম- মেঘ দেখার স্বপ্ন। ষষ্ঠ-বৃষ্টি বর্ষনের স্বপ্ন দেখা। সপ্তম- তারকারাজি স্বপ্নে দেখা। অষ্টম- সূর্যকে স্বপ্নে দেখা। নবম-চন্দ্রালোক স্বপ্নে দেখা। দশম- আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্বপ্নে দেখা।

উপকারিতা

"জাওয়াহেরে খামসা" গ্রন্থে হযরত গাউছে গওয়ালরী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) লিখেন, প্রকাশ থাকে যে, মানবীয় রহস্য দুটি অংশে বিভক্ত। শেষ অংশে অর্থাৎ শেষভাগে রয়েছে অন্ধকার ও আঁধার। আর প্রথম অংশে অর্থাৎ অগ্রভাগে নুর (জ্যোতি) ও আকল (বুদ্ধি)। তাছাড়া উভয় অংশের মধ্যবর্তী একটি সীমারেখা রয়েছে। নিদ্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ঐ রন্ধ্রের (সীমারেখা) উপর যখন সুগঠিত একটি পর্দা আবরণ সৃষ্টি করে, তখন ঘুমন্ত ব্যক্তির তন্ময়তা ও অচৈতন্য শুরু হয়। এমন কি চোখের উপরও ঐ অচৈতন্য ভাবের প্রভাব পড়ে এবং স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবের আধিক্য তৈরি হয়। অতঃপর কান, জিহবা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় তখন নিষ্ক্রীয় হয়ে দিল (অন্তর) নামক ইন্দ্রিয়ে উপনীত হয়। যা ব্যক্তিকে বেহুশ করে দেয় এবং ইহাই হল নিদ্রা। সেই সময় আলমে মেছাল (স্বরূপ জগত) উম্মুক্ত হয়ে যায়।

"তাযকিয়াতুল ক্বলুব" গ্রন্থে আছে, আলমে মেছাল (স্বরূপ জগত) এমন একটি জগত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব সৃষ্টি করার পূর্বে ঐ আলমে মেছালকে সৃষ্টি করেন। এই পৃথিবীর সৃষ্টি কাঠামোয় ঐ আলমে মেছালের কাঠামো তৈরি করা হয়নি। কিয়ামতের ময়দানে সেরূপ প্রত্যেক লোক যেভাবে

তাদের ভাল ও মন্দ কাজ দেখবে তদ্রুপ ঐ জগতকেও (আলমে মেছাল) দেখানো হবে। ঐ জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ সহীহ হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। সেই জগতকে অস্বীকারকারী পাপী সাব্যস্ত হবে। অদেখা কোন বস্তুকে অস্বীকার করার কোন কারণ হতে পারে না। যেমন আনকা (কাল্পনিক স্বর্গীয় পাখি) নামটি খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেউ এই প্রাণীকে দেখে নাই। এই পৃথিবীতে যেই মানুষগুলোকে মানব আকৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়, ইহা তাদের মূল আকৃতি নয়। তাদের এই আকৃতিও মূল আকৃতিতে আলমে মেছালে যাহের হবে না। সেখানে (আলেমে মেছাল) তাদের আকৃতি তাদের আমলের প্রকৃতি অনুসারে হবে। যেমন- এই পৃথিবীতে ব্যভিচারকারী ব্যক্তির আকৃতি ঐ পৃথিবীতে (আলমে মেছাল) কুকুরের আকৃতিতে হবে। কিয়ামতের দিন পাপীগণ যখন তাদের নিজেদের আমল সমূহের আকৃতি দেখবে, তখন তাদের বড় আফসোস হবে। কিন্তু আফসোস ও পেরেশানী ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকবে না।

মুমীনদের উচিত খোদা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হুকুম অনুযায়ী স্বীয় আমল সমুহকে বিশুদ্ধ করে নেয়া, যাতে ঐ আলমে মেছালের মধ্যে স্বীয় উত্তম মানবীয় আকৃতি অটুট থাকে, যেইভাবে এই দুনিয়াতে তা রয়েছে। এই কথা গুলোর বিস্তারীত বর্ণনা নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে। যার বেশি আগ্রহ রয়েছে, তিনি উক্ত কিতাব সমূহ দেখতে পারেন। ঈমানের নুর দ্বারা যে সমস্ত লোকের অন্তর অলোকিত হয়েছে, তাঁদের চক্ষু খুলে গেছে। তাঁরাও এই দুনিয়া থেকে ঐ আলমে মেছালকে দেখতে পান। আমাদের ভাইদের মধ্যে অধিকাংশকে এই গুণে গুনান্বিত পাওয়া যায়।

কিছু উল্লেখিত স্বপ্নের রহস্য

এ কথা গোপন থাকে না যে, সত্য অনুসন্ধানীর জন্য পীরে কামেল ও মুরশিদে মুকাম্মিল; যিনি ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ স্তর অতিক্রম করে মুশাহাদা (দর্শন) স্তরে উপনীত হয়েছেন, তিনি নবী ও রাসূলের স্থলাভিষিক্ত। বরং রাসূলে হাক্বিক্বি। নিম্নোক্ত হাদিসে নববীর উপর আমল বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বেলায়তপ্রাপ্ত ও মা'রিফাতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ একমত হয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "পীর স্বীয় জাতির জন্য, যেমন নবী তার উম্মতের জন্য।" উল্লেখিত হাদিসে "কাফে তাশবীহ" (সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য অর্থ প্রদানকারী 'কাফ' বর্ণ) যেন একটি নেকাব ও মুখবন্ধ স্বরূপ। যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট মুখাবয়ব তার মাধ্যমে গোপন করা হয়েছে। যেমন "নুর" শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াত শরীফে অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে দ্বিতীয় "নূর" উদ্দেশ্য; যা রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সত্তাকে বুঝায়। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "আল্লাহ আসমান ও জমীনের নুর; তাঁর জ্যোতির উপমা" (সূরা

নুরঃ ৩৫)। আর ইহা ছয়টি তানায্যুলের প্রথম তানায্যুলের দিকে ইঙ্গিতবহ। কেননা যেই মাহবুব বান্দা সুউচ্চ স্তরের মাহবুবীয়তের আসনে সমাসীন হয়েছেন এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশস্থল হিসেবে পূর্ণ কামলিয়তের অধিকারী হয়েছেন, নিশ্চয় তাঁর অনুরাগ অপরাপর মাহবুব বান্দাহ (প্রেমাস্পদ) থেকে অধিক হবে। আর তাঁর সত্তার ইজ্জত (সম্মান) এর পর্দা সুমহান আবরণের অবগুণ্ঠনে লুকায়িত।

সীমাহীন সৌন্দর্য্য ও অতীব আলোকময় হওয়াতে নিজেই নিজের সত্তার আবরণ হয়ে থাকেন। যেমন সূর্য, কেননা ইহা সীমাহীন উজ্জ্বল ও আলোকময় হওয়াতে ইহা নিজেই নিজের জন্য আবরণ বা পর্দায় পরিণত হয়। সেই কারণে হযরত সৈয়দ আব্দুস সালাম বিন বাশীশ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় মোনাজাতে ইরশাদ করেন- "হে আল্লাহ হিজাবে আযম (বড় আবরণ) কে আমার রূহের হায়াত (জীবন) পরিণত করুন।" 'হিযাবে আযম' দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সত্তা উদ্দেশ্য, যা পূর্বোক্ত মোনাজাতে বুঝা যায়। "তোমার 'হিজাবে আযম' যেটি তোমার জন্য তোমার সামনে উপস্থিত"। সেই কারণে সূফিয়ায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বরযখে কুবরা (বড় পর্দা) বলে থাকেন। আর মুর্শিদে কামেলের ছুরত (আকৃতি) ধ্যান করাকে শুগলে বরযখ (বরযখের আমল) বলা হয়।

গজল

বিচ্ছেদের বিরহ এতই বেড়ে গেছে যে, আমাদের দিদার দানে ধন্য করুন।
আপনি হলেন অবগুণ্ঠনের পর্দা ও আলো স্বরূপ।
আপনার সান্নিধ্যের শেষ পরিণতি হল আপনার থেকে দূরে থাকার কারণ
কেননা আপনি দৃষ্টি সমূহকে পেতে পারেন
কিন্তু দৃষ্টি সমূহ আপনাকে পেতে পারে না।
আপনার প্রকাশমানতার মাধ্যমে চোখের অন্ধত্ব (অজ্ঞানতার অন্ধকার) দূরীভূত হল,
কেউ যেন আপনার দিদার (দর্শন) থেকে বঞ্চিত না হয়।
আমাদের বাহ্যিক চোখ অন্ধত্বের কারণ,
অথচ তাঁর পবিত্র চেহারার দীপ্তি আলো ছড়াচ্ছে।
আমরা বুলবুলি পাখি ফুলের সাহচর্য থেকে দূরে আছি,
অথচ ফুল বাগানে বসন্ত বিরাজ করছে।
চেহারার অবগুণ্ঠন জগতের একটি রীতি,
কেননা অন্ধকার থেকে খোদায়ী নুর পর্যন্ত সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে।

প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন শান-শওকত সহ তিনি আগমন করেছেন,
যেন বহুরূপী শান-শওকত সহ খাটি স্বর্ণ।
প্রেমময়তার শান হল বহুরূপী ও হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হওয়া,
তাঁর সৌন্দর্য্যে প্রেমিকের জন্য ইশকের স্বাদ সৃষ্টি হয়েছে।
যদি অধম আপনার কাছে মকবুল (গৃহিত) হয়, তা'হলে মণি-মুক্তাও আমার কাছে তুচ্ছ,
যে ব্যক্তি একত্ববাদের মণি-মুক্তার ক্রেতা হবে সে মুর্খ হবে না।
তাঁর সুদর্শন শাহী পেয়ালা থেকে এক চুমুক ইশকের শরাব পান করে চুপ করে
তাঁর কদমে বসে থাক এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
চোখের অবস্থা এই রকম যে, ইহা আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।
পৃথিবীর ধূলা-বালি চোখ থেকে ঝেঁড়ে ফেল,
মাইজভাণ্ডারের মাটিকে চোখের সুরমা হিসেবে ব্যবহার কর।
গাউছে মাইজভাণ্ডার হলেন জগতের প্রেমাস্পদ,
তাঁর ফুল বাগানের পাদুকায় জান-প্রাণ উৎসর্গিত।

অতঃপর যেই মাহবুব বান্দা উক্ত গুণের অধিকারী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্থল হিসেবে পূর্ণ কামালিয়তের অধিকারী; তাঁর মাধ্যমে মাহবুবিয়ত (প্রেমময়তা) স্তরের পরিসমাপ্তি হয়। আর তিনি খাতেমুল মাহবুবীন (প্রেমাস্পদদের পরিসমাপ্তকারী) হিসেবে সাব্যস্ত হন। বরং বিশ্বের সমস্ত মাহবুব বান্দাহগণ তাঁর নিসবতের মাধ্যমে প্রেমময় স্তরে অবস্থান করেন এবং তিনি তাঁদের ইশক (বাসনাশূণ্য প্রেম) এর প্রকাশস্থল হিসেবে পরিণত হন।

কবিতাংশ

প্রেমময়তার যে শর্ত ছিল তা আপনাতে এসে শেষ হল,
যত জন প্রেমিক রয়েছেন সবাই আপনার পবিত্র দামানে এসে হয়রান ও হতবাক।
খোদার সাম্রাজ্যের প্রেমিকদের আজ যে পূর্ণতা এল,
হে প্রিয়! সবার মাথা আপনার পবিত্র পদযুগলে।

আর প্রকাশ থাকে যে, যেই মাহবুব বান্দা স্বীয় মাহবুবিয়ত (প্রেমময়তা) এর মধ্যে শক্ত অবস্থানে থাকেন এবং তাঁর অনুরাগ ও ভালবাসাও বেশি হয়। নিশ্চয় তাঁর আশেকদের (প্রেমিক) বেদনা ও পেরেশানীও বেশি হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদিসে সেই ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় আমি নবীদের মধ্যে উম্মতের জন্য সর্বাধিক পরীক্ষাকারী"। উক্ত রহস্যের উপর ভিত্তি করে খোদা তায়ালা স্বীয় মাহবুবে পাক 'লাওলাকা' তাজের অধিকারী হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিম্নোক্ত আয়াতে সম্বোধন করে বলেন-

'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করুন।' (সূরা মুযাম্মিল: ১-২)। অর্থাৎ হে সর্বাধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত মাহবুব, হে পূর্ণতা প্রাপ্ত মাশুক (প্রেমাস্পদ), মাহবুবিয়তের (প্রেমময়তা) সম্মানিত কম্বল স্বীয় জ্যোতির্ময় চেহারা থেকে সরিয়ে নিন। আর প্রেমময়তা ও প্রেমযুক্ত হিজাব (পর্দা) ও কারিশমাযুক্ত প্রেমময়তা প্রকাশের নিকাব (পর্দা) জ্যেতির্ময় সূর্য সদৃশ্য চেহারা থেকে সরিয়ে নিন। আর ইশকের পেয়ালাযুক্ত ব্যাথাতুর রাত্রিসদৃশ্য অন্ধকারকে আলোকময় সূর্য সদৃশ্য চেহারা থেকে সরিয়ে পরিস্ফুটিত করুন। আর ইহা প্রকাশ থাকে যে, যেই আশেক এর বিরহ, পেরেশানী ও হৃদয়ের ব্যাথা বেশি হবে, তার সাথে তার প্রেমাস্পদের নৈকট্য সবচেয়ে বেশি হয়। নিম্নোক্ত হাদিসটি ইহার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের আলেমগণ (অলি) বণি ইসরাঈলের নবীদের মত।"

গজল

আপনার অবয়বের মত প্রেয়সী কোন প্রেয়সী নাই,
আপনার মত নেই কোন মানব, নেই কোন পরী, নেই কোন সূর্য ও আকাশ।
সারা জগতের চতুর্দিকে আমি প্রদক্ষিণ করলাম,
কিন্তু আপনার মত কোন চন্দ্রমুখী নাই এবং কোন প্রেয়সীও নাই।
প্রণয়সূচক আচরণ, প্রণয়াসক্ত অঙ্গভঙ্গি, লাজুকতা, প্রণয়সূচক মান-অভিমান ও
কমনীয় ভঙ্গিতে আপনি নিজেই নিজের তুলনা,
আপনার তুল্য দ্বিতীয় আর কেউ নেই ।
আপনার সৌন্দর্য্যের দ্বীপ্তি হল খোদার দ্বীপ্তি,
যদিও আপনি খোদা নন কিন্তু খোদা থেকে পৃথক নন।
সেই কে যে আপনার ইশকের তররবারির আঘাতে নিহত হয়নি,
এমন কোন কি প্রাণ আছে যে আপনার উপর প্রতি মহুর্তে উৎসর্গিত নয়?
আপনি স্বীয় প্রেমময়তায় প্রেমমূর্তির বাদশাহ,
এমন কোন কি প্রেম মূর্তি রয়েছে যে আপনার দ্বারের ফকির নয়?
মকবুল (গ্রন্থকার) ঐ প্রেয়সীর পদযুগলে ফানা (বিনাশী),
যদিও তিনি খোদা নন কিন্তু তিনি খোদার পক্ষ থেকে গাউছুল আজম।

প্রিয় বান্দারা অনাদিকাল হতে পবিত্র নুরে মুহাম্মদ ও পবিত্র হাকিকতে আহমদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে প্রতি যুগে ও কালে হরেক রকম বেশে এবং বহুরূপী অবয়ব দ্বারা বর্ণনা উপস্থাপন করে চলেছেন। আর ইহার আশ্চর্য ও বিরল শান-শওকত স্বীয় প্রেমাস্পদদের দেখিয়ে আসছিলেন। অতএব বর্ণিত আছে যে, "সত্তর হাজার বছর ঐ নুর বরকতময় ইয়াকীন বৃক্ষের মধ্যে শুভ্র মুক্তার অবগুণ্ঠনে ময়ূর এর আকৃতিতে বিদ্যমান ছিলেন এবং একলক্ষ

বছর পর্যন্ত লাল ইয়াকুত পাথরের মোমবাতির ভিতর তাসবীহ ও তাহলীল পড়ার মধ্যে রত ছিলেন।"

এইভাবে ঐ পবিত্র নুর আরো অনেক পর্দা সমূহে অবস্থান করেন এবং প্রতিটি পর্দার অভ্যন্তরে ঐ নুর স্বীয় প্রেমময়তার আশ্চর্য ও বিরল বর্ণ ধারণ করেন। আর ঐ নুর হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর শরীরকে বাহানা বানিয়ে নিজেই ফেরেশতাদের সিজদা গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ নুর আল্লাহ্র ঐ নৈকট্যের বাগান থেকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের আঙ্গিক বাস্তবায়নে আগমন করে কর্মস্থল পৃথিবীকে সুব্যবস্থাপনায় আনয়ন করেন। অতঃপর, ইহা হযরত নুহ (আলাইহিস্সালাম) এঁর দেহ মোবারকে অবস্থান করে নয়শত বছর কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান করতে থাকেন এবং ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে জুদী নামক নিরাপদ পর্বত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। অতঃপর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মুখোশ পরিধান করে ছদ্মবেশে নমরূদের রাজ্যকে ধ্বংস করে দিলেন এবং নমরুদের আগুনকে নিরাপদ বাগান ও ভাল স্থানে পরিণত করে দিলেন। এইভাবে ঐ ফয়জপূর্ণ নুর হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) থেকে ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস্সালাম) এঁর ছদ্মাবরণে রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে পয়গাম্বরী শান প্রদর্শন করেন এবং মোহিনী ও প্রণয়ী আর্তনাদ দিতে দিতে চলে আসেন। শেষ পর্যন্ত ইহা (নুর) স্থানান্তরিত হতে হতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত ছদ্মবেশের বাহানা দেখিয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর ইহা হযরত আমেনা যাহরিয়া এঁর পবিত্র গর্ভাশয়ে পর্দা বিহীন প্রকাশ লাভ করে পৃথিবীর সাম্রাজ্যে আগমন করেন। আর ইহা ভালোবাসাপূর্ণ রাগ ও প্রণয়পূর্ণ মান অভিমান প্রদর্শন করলেন। ইহা স্বীয় সম্মানের তরবারি দ্বারা কথায় ও তরবারির মাধ্যমে বিদ্যুতের ঝলকানি প্রদর্শন করলেন এবং কুফরির অন্ধকারকে পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ন মিটিয়ে দিলেন। আর মোহরে নবুওয়তকে স্বীয় নামীয় নামে পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

বন্ধুগণ! ইহা মনে করোনা যে, ঐ পূর্বোক্ত ফয়জপূর্ণ নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর স্থানান্তর কি এখানেই থেমে গেল? আর ইহার ঐ ঔজ্জ্বল্য ও মোহিনী শক্তি কি শেষ হয়ে গেল? না, কখনও না! ইহা কি করে হতে পারে? অথচ ঐ পবিত্র নুর সাহেবে লওলাকা (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন জগতের রূহ। জগতের হায়াত (জীবন) এই বরকতপূর্ণ নুরের সাথে সম্পৃক্ত । আর জগতের কার্যাদি এই ফয়জপূর্ণ নুর দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। বরং কালের বিবর্তন, রাত ও দিনের পরিবর্তনের ফলে উক্ত নুরের স্থানান্তর ও প্রবাহমানতার পদ্ধতিতে অবশ্যই পার্থক্য তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ খতমে নবুওয়ত (নবুওতের পরিসমাপ্তি) এর পূর্বে খোদার ঐ পবিত্র নুর